ত্রিপুরা সাহিত্য খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব

সম্পাদনা

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পন্দন

সন্তান প্রেস, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা—৭৯৯০০১

Tripura Literature Volume

Second Part

edited by

Satyen Bandyopadhyay

ত্রিপুরা সাহিত্য খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুআরি, ১৯৯৪

আগবতলা বইমেলা

মুদ্রক ঃ পীযূষ পাল, সন্তান প্রেস, হবিগঙ্গা বসাক বোড,
আগরতলা—৭৯৯০০১

প্রকাশক ঃ পীযূষ পাল, স্পন্দন প্রকাশনী, প্রযত্নে, সন্তান প্রেস,
হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা—৭৯৯০০১

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার
প্রয়াত
ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

ও

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি
বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী
স্মরণে

সূচিপত্র

দীপঙ্কর এখন আর নেই। সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানেন, অসুস্থ রোগ হঠাৎ তাঁকে নিয়ে গেছে আমাদের থেকে। তারপর বছর ঘুরে গেলো, কিন্তু দীপঙ্করের কবিতা দিনের পর দিন আরও বেশি দাগ কাটছে কবিতাপাঠকদের মনে, কবিদের মাথায়। কবি দীপঙ্কর, চলচ্চিত্রপ্রেমী দীপঙ্কর, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ-চলচ্চিত্রকার দীপঙ্কর এখন সদ্য-অতীত। বর্তমান হয়ে আছে তাঁর কবিতা, চলচ্চিত্র-বিষয়ক আলোচনা, আর কবিতামেশানো চলচ্চিত্রের নোটবুক। দীপঙ্করের তেমন একটি নোটবুক / ডায়েরি থেকে কয়েকটি কবিতা এখানে প্রকাশিত হলো।

সম্পাদক, স্পন্দন ।।

দীপঙ্কর সাহার কবিতার ডায়েরী থেকে

কাস্তে মনে রেখে

অগ্রজ দীনেশ দাসকে

আধো ঘুমে—আধো জাগরণে
তপ্ততার নিরসন হয় কোনখানে ?
পেছন বাড়ীতে মাটি চাপা কাস্তে—
কি ধাতুতে গড়া—
সত্য না মিথ্যা !
কি ধাতুতে গড়া—

সত্য

যে সত্য কাছে এসে ধুলোয় লুটায়
তাকে নিতে গিয়ে দেখি পান্না সোনা
যেন মোহিনীমায়া !
আমার ভেতরে সংহতরূপে কোথায়
এসেছি অজানা বিরল বিকেলে
ঘুরে মরেছি কোথায় পান্না-সোনা !

ব্যাঙ্গালোর / ৪.২.৮৫

দীন ১

অভূতপূর্ব মানুষের জয়গান ভেসে আসে
বিদ্যুৎ বিভ্রাট আলো থেকে অন্ধকারে,
পবিত্র দিনে বালিকার সঙ্গ পেতে
সমস্ত রঙ্গীন নিশান উড়ছে পত্‌পত্‌!
স্বাধীনতার রামধনু আমাদের নজরে—
ঘাড় কাত করে মানুষের কেতাবী শরীর
একদিন মিলে মিশে গেছে গভীর মাটিতে!
দীনমানুষের জয়গান ভাসে
অভূতপূর্ব বিদ্যুৎ বিভ্রাটে আমাদের জীবন
আলো থেকে অন্ধকারে!

দীন ২

আর্থিক সহযোগিতায় যতোটা দালাল
হতে চেয়েছি তার বেশি—
সমস্তক্ষণ মানুষের সাথে
মাংস কিনেছি আমি, শুয়োরের
জীপের স্টীয়ারিং থেকে—
'ডিয়ার আমাদের মৃত্যুর কোন,
বিকল্প নাই!'

পাহাড় থেকে নেমে গেছে
অজানা জলোচ্ছ্বাস।

আমার সন্তান

সমস্ত কথা সম্পর্ক
আমাদের হৃদয়ের এই অপচয়
যেভাবে হৃদয় ভরেছে
আমার সন্তানের কথা
আমাদের কথা
ভালোবাসার মতো

পরিবার অনির্লাভ রহস্যের

ভেতরের যে অঙ্গীকার
আমাদের সাথে প্রান্তরে।
আগরতলা / ১৪.৫.৮৫

আলোর লোক ১

আলোর লোক কি আমাদের
কথা ভাববে ?
যে দুঃখী সরলতায় পরিপূর্ণ
খাদ্যের কথা ভাবে
আর চোখ মুছে
দুঃখীদের ভীড়ে মিশে থাকে।
দুঃখীর ক্ষুধা হীনমন্যতা নয়
তাদের নোংরা বেশবাস নয় সবকিছু
সারা উপত্যকা জুড়ে যে নগ্নতা
উপেক্ষা করে চলে যায় আলোক
তাদের ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ
করছে একদল গাধা
বোঝাভরতি লুণ্ঠণকারী !

আলোর লোক ২

দুঃখীদের ভালোবাসা নিয়ে
যেসব কবিতা লেখা হয় নিঃসাড়
মনে পড়ে বাবুরা শতদলের প্রস্ফুটন
যে জড়াজড়ি কোনও লাবণ্যতা নেই
মনে হয় মুখোশের অবিরাম মহড়া !

বিনীত মুখশ্রী সারি সারি
শহর থেকে গ্রামে
নদীবন্দর পেরিয়ে
আন্তর্জাতিক হাওয়া
আর নয়

তারা দুঃখী কিংবা সুখী
আইডিয়েল বা ঘুঘু।

আলোর লোক ৩

কোলকাতার সংসারে ধনুকের ছিলা
রাখে টান
আলো-অন্ধকারে যে চ্যালেঞ্জ
সমস্ত সত্য স্বীকার করে নিয়ে
এক নীরবতা ও ঝড়ো হাওয়া!
সন্ধ্যা নামে ব্রহ্মার দুর্বলতায়
এলোকেশী তুমি চুলের অন্ধকার
মেলে ধরো
সন্ধ্যা নেমে আসে
আমাদের চরাচরে
ধীরে জাগে আমাদের
বিপুল অন্ধকারে

আলোর লোক ৪

ভুল ও সত্য কোন পরমায়ু নেই
তবুও আমি বিশ্বাস করেছি সবকিছু!

কারাগার

মানুষ তুমি,
কারাগারেও জয়গাথা শোনো
শেষবার তাকিয়ে থাকো তাদের প্রতি
১৭ লক্ষ মানুষের গালে তপ্ত নুনজল
সমুদ্র অবধি একাগ্রতা বন্দী আমাদের!
নিজের উত্তেজনা চেপে গিয়ে
পৃথিবীর ভেতর মানুষ কারাগারে?

কলকাতা / ২৭.৩.৮০

স্পন্দন, জুলাই ১৯৯০

রাতুল দেববর্মণ

তিনটি কবিতা

ধর্মে পোড়ায় সুখ

হে অবতারিণী ভবতারিণী
কৌলিন্যে আছিস, কৌপিনে লাবণ্যে
ত্রিপ্রহর না-পেরোতেই স্বর্ণজলধারায়
নেমে এলি এই ভবধারায়
তোর অই ত্রিচক্ষুতে চড়ং না ভড়ং
মাচাং-এ নবরং মাখিয়ে মুখ
দিতে এসেছিস এ কোন সুখ!

হায় আহ্লাদী প্রহ্লাদ,
জহ্লাদও নেয়নি তোকে!
ভেসে যা তুই ভাসিয়ে দে গা
তিড়িং বিড়িং নাচা জলের ওপর পা
মাতারাণী ডেকেছে তোকে, এবার স্বর্গে যা।

ত্রিমোহিনীর খোঁজে

ত্রিমোহিনী ডেকেছে আজ পদ্মমেঘা ত্রিপ্রহরে
যাবো বলেই তুলসী জবায় ঢেকেছি শরীর
তোলপাড় চিল্কা হাওয়া সরিয়েছি দূরে
নিথর শরীরকে করেছি দ্রুতগতি নীহারিকা
যে পথে অন্য কেউ যেতে পারে না
সেভাবেই নিজেকে করেছি তৈরী পরম্পরায়
ঘনঘোর ঢেকে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়

ত্রিমোহিনী নিজেই সরে যেতে চায়
বাগান ভেঙে উপড়ে ফেলে সমস্ত গাছ

ত্রিমোহিনীকে আজ কোথাও খুঁজেই পেলাম না

ইমন কল্যাণ

খোলা হাওয়ার দিকে হেঁটে যাই আমি
লেগেছে জট ছিন্নভিন্ন স্বৈরিণী হাওয়া
পরিচিত মুখ দেখে হরিণীর মতো সুখ
শরীর দোলাতে গিয়ে দেখি নতজানু মুখ
ইণ্টারলকের জটিল মুখমণ্ডল তার
জড়াজড়ি খেয়ে পড়ে থাকে বীতশোক হিমে ;

চেনাজানা মুখ তার সেও কী ভুলে যায়
আগরতলা, ধানক্ষেত, বনপেয়ারার খাসা দিন,
ঘাসের ওপর দিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে
সে কররেখা, সে দাগ তো মোছেনি এখনও
তবে কেন ভোলাতে চাও প্রিয় নারী
আমাকে ভোলাতে চায় রবিশঙ্করের পরমেশ্বরী
আলী বড়ে গোলামের চাঁদনী কী রাত,

অবিরল ঢেউ খেলে জমিনের ধান
খসখসের রাত মোহায়িত সয়েদের ইমন কল্যাণ।

লণ্ডন, জুলাই ১৯৯৩

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

দুই হাত শূন্যে তোলে শিশু

আমারও শিয়রের কাছে ঝোলানো আছে
কিছু বিদেশী পোষাক ;
ঝুলন্ত জামা মাঝরাতে আপনা থেকে বড় হয়,
অপঘাতে মৃত মানুষের হাত পা
মণিবন্ধ বেরিয়ে পড়ে আড়াল থেকে,
মৃত্যুর আগে কারো নিরাপত্তা নেই জেনে কেউ
পিস্তল রেখেছে পকেটে, বোতামে কারো সাজানো গোলাপ।

পুরনো আকাশ ধ্বসে পড়ার আগে
বিমান নামার মত শব্দে আমাদের অস্তিত্ব
ডুবে যাচ্ছে বিকেলের পড়ন্ত আলোয়,
তখনও সীমানা ছাড়িয়ে একটি শিশু
দুই হাত শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

২৫.১১.৯২

নকুল রায়

শেকড়-বাঁকলে

১
অন্নদাসের চিরাগ জ্বলছে
ঘরে, মগজে আসন পেতে
ঘুমায় শিশু ছেলের মা,
কোথায়! ছিন্নমূলের জননী

পথের দিকে মুখ রেখে
অন্নদাসের পা চলে—
নাঃ, কাক নেই, উৎসবও নেই

২
মাছি উড়তো, যখন পচে
যাচ্ছিলাম, পালাবো
কোথায় ধরছে ব্যথা
সেই সময়, সামনে সিঁড়ি
গড়িয়ে পড়লে তুমি

পরীরা এমনও হয়!

৩
রাত্রির তারারা খসে
বালিতে, মাকে বলি:
তুমি বাবাকে কী পেয়েছিলে!

গরম বালির চাদরে
মায়ের আঁখি ছিঁড়ে
ঝরে পড়ে তারাশ্রু

৪
আমাদের হাতে ছিলো না
টাকা, ছিলো সজ্জন বসন্ত
সহসা বাঁকাপথে একদিন
ঢুকে গেছি ময়দানে
বাড়ি ফিরে এলাম
বাবাকে বললাম: তুমি
তৈরি থেকো, আমি
শহীদ হচ্ছি প্রকাশ্যে—
মাকে দেখলাম দূরে থেকে
ভাইকে দেখলাম না
বোনকেও না

তারপর অনেক নদী
অনেক সমুদ্র—
লোহিত সাগর পেরিয়ে
এখন ডাইনিং টেবিলে
টি ভি চালিয়ে ভাত খাচ্ছি
ছেলেকে পড়াই, স্ত্রীকে
বলি, তুমি আরো
সেজে থাকো, নইলে
প্রমোশন হবে না আমার—
আমি ঘরে ফিরে
আসি, পুরনো ঘরে
বাবাকে দেখিনা, মাকে
জানিনা, ভাইকে নয়
বোনকে নয়—
আমি এক মধ্যবিত্ত
মেদবিত্তে বেঁচে আছি
ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে

৫
পাহাড়ে ফাটল
আত্মবিশ্বাসে চলে ফেরে
সৌর সকালের মানুষ

উগ্রপন্থীর ভূত নয়,
এখন ভবিষ্যৎ ক্ষুধা

সরল মানুষ মেরে কেটে
কে কাকে স্বাধীন করে

উগ্রপন্থী ভূত হয়
খাদ্য হয় খবরে

৬
শরীরে শেকড় চলছে
টের পায় কিছু সুস্থ
মানুষ, প্রতিবাদ
চলতে থাকে —

কীটনাশক প্রেম
ছাড়িয়ে হাঁটছে
কিছু যুবক-যুবতী,
একা বালিকা দেখে শেখে

৭
পাথর সরাতে পারে না বীজ
মাটির চাদরে খোলা
বাতাসে মুগ্ধ জীর্ণতৃণ
দুদিনেই দুটো পাতা পজালো
তেমনি বাঁকা পথ ধরে
একটি পথের বালক এসে
ঢুকেছিলো ঘরে,

কী করবো, সে চেয়ে থাকে
কেবল জানলা খোলা মাঠে

বললাম : কার ব্যথা মনে
পড়ে ? নিচুস্বরে বলে : মায়ের
কাছে যাবো—
মা কোথায় ? সে হাত তুলে
দেখালো ঘরের ছাদ ।

৮
প্রতিটি দুঃখের নিজস্ব গতি
আছে, যাকে না-চাইলেও
পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে,

কোন পাহাড়ের নদী তুমি
যে বলছো সমুদ্রে যাবে,
বেগবতী ও ভোগবতী হলেই
স্বাদ আসে সমুদ্রের
নইলে এতশত ছড়া
নালা ও নর্দমা খেয়েও
তোমার নিজস্বতা খুঁজে
পাওয়া যাবে না

তুমি আছো যে-আনন্দে,
তাকে গিয়ে বলো আগে :
কতটুকু দুঃখ জেনেছো
আমার তুমিগো

৯
কান টানছি, তুমি
এলে না, এলো
মুখোশ ।
যাকে দেখি বিপদে হাসে
সে আসলে বীর নয়, না
বীরাঙ্গনা, হীনমন্য রোগে

হাসি আর কান্না, ভালো
মানুষের শান্তি কেড়ে নেয়,

যাকে জানি ভালো, তার
মুখোশ হলো পায়ের
জুতো, সুদৃঢ় পদাতিক

১০

ভালোবাসার ক্ষেত্রফল
নেই, কতো ইঞ্চি সাধনার
ফসল চাও তরুণী দি ?

পীরিতির জলা-জঙ্গলাতেও
নীল শাপলা ফোটে

ভালোবাসা গর্ব নয়, গৌরব
ঘরে ঢুকবো, চাবিতে
না-হলে তালা ভাঙবো

ভেতরে আমার গৃহস্থলী,
বাইরে বাজার, পণ্যতা

১১

শহরতলানী চলছে, শহর
হচ্ছে উগ্রপন্থা

বন্যারা শহরে সুন্দর
শিশুরা দাসীক্রোড়ে

শহর হচ্ছে বৃদ্ধ
রাম-বাবরে
পাহাড় আসছে সমতলে,
সমতলে পা নেই, হাড়

মৃত্যুর ক্রুশ বায়া
বহন করছে, ওরা কেউ
যীশু নয়, নিরীহ মানুষ
তলানি চলছে, আর
শহর হচ্ছে নবীকরণ

১২

খুনপোকারা হাড়ের
ভেতর, মূল্যবোধের আক্রমণ
নেই, সর্বস্বান্ত, আজ
কেউ বড়দিনের
ছোট দিনের

মানুষ খুব নিচু
স্বরে কথা বলছে
বসবাসে অবিশ্বাস
বিনাশ্রমেও ঘাস মেলে না

তরল অন্ধকারে
ভেসে চলে নদী,
জীবন যাপন খড়কুটো

১৩

মনের ওজন দিয়ে
তোমাকে দেখেছি নিসর্গে,
শুধু ফাঁকা ঘরের
বাইরে খোলা মাঠ

একটি বালক আপন
মনে নিজের বলে
নিজে ব্যাট চালাচ্ছে

গ্রামে এখন নবান্ন নেই
শীতের পিঠেপুলিও নেই
ঘুম ভাঙলে দেখি
নিজের স্বার্থ কতখানি
বেড়েছে,
ভালোবাসার ফটো
থেকে ঝরে পড়ে নিঃসঙ্গতা

১৪

সামনে মুখোশ পড়ে
আছে, তুমি নাও যেমন
ইচ্ছে, এ তোমার স্বাধীনতা

কোথাও ছিল নাকি ব্যাধি
মনের ? তবে মুখোশ কেন
হাত দিয়ে নিজের চোখ
ঢাকো, না-দেখে মুখোশ
পরে কিছুই মেলে না
চাওয়ার,

মূর্তিকে দেবী ভাবলে
ক্ষতি নেই যদি
সেখানে মানুষ থাকে—
কারণ, তোমার মুখ তোমারই

১৫

আমার হাত তোমার
হাতে মিশেছে নির্ভয়ে,
নির্ভাবনায় নয়, তুমি
আছো এই ভাবনাতেও
আমি আছি

বাধা আসতেই গেলাম
দূরে ছিটকে, আমি
ধরলাম সময়, নদীর
স্রোতকে, অর্থাৎ অপেক্ষা

উদ্ধার এলো পুনর্জাগরণে,
হাতের ধরণ থেকে
বুঝে নিলাম সত্য,

সত্য কেবল নিজের নয়
অন্যকেও জানালে নির্ভয়ে

১৬

মগজে রাত্রি, হৃদয়ের
সৌরসকালে দেখা হোক
বার বার
প্রিয় মানুষ ফুরিয়ে
যাচ্ছে, অচেনার ভান
করে চলে কেউ, তার
গোপন ইচ্ছাটিরে যেহেতু
জানি না আমি

মগজে রাত্রি, কিছু লোক
আছে বন্ধুর চেয়েও বেশি,
যাকে দেখলেই জ্বলে পথ
অন্ধকারের সিঁড়ি

১৭

অবক্ষয়ের দিনগুলি
আসে অক্টোপাশের
ছদ্মবেশে, একটা পা
ছাড়াতেই আরো চারটে
কিংবা বেশি ধরে চেপে,

অস্ত্র ছাড়া রেহাই নেই,
আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে
ভালোকথারও দাম নেই
আত্মবিশ্বাস ছাড়া
যে-মানুষ রুটির যুদ্ধে
পরাস্ত, যে-হাজার
মানুষ বাঁচতে শেখে না
এরা ক্রীতদাস,
ধ্বংস হোক জড়তা,
জেগে উঠুক শেষ মৃত্যু
লাল হোক বিবেক-লাল

১৮

ধর্মকে খুন ক'রে রাজনীতি
বাঘ হচ্ছে ক্রমশ
রাজনীতির বাঘেরা
রাম খায় বাবর খায়

মানুষের অস্ত্রে মানুষ
খুন, মানুষ খায় মানুষ
মহাবারুদের দিনগুলি
মহাভারতে নতুন শুরু,
আদিবাসীদের অস্ত্রে রাঙা
হচ্ছে আদিবাসীরা

শিক্ষিতের আন্দোলন
চায়ের দোকান বন্ধ
হলেই শেষ, সমগ্র
বিষয়ে মাস্টারগণ
ক্ষতি করছে বেশি,

সাংস্কৃতিক কাগজপত্র
সব খেয়ে ফেলছে
রাজনীতির বাঘেরা,

বেশি কৃষ্টি ক'রো না,
তোমার ঘর থেকেই
সড়ক, গরাদের আঁধারে
চলে গেছে স্বাধীন

১৯

প্রান্তরে আছে অন্তরেও
আছে, পাখী তোমার
ডানায়
দুদিকের ভারসাম্যে
জানা থাকে দুপক্ষের
খবর

মানুষের, দুহাতের মানুষ
ভারসাম্যে ক্লান্ত—
খুব বেশি হলে
দুহাত সামনে মেলে
ঝাঁপ দিতে পারো নিচে

তবুও কিন্তু বৃত্তাকারে
উড়ে গিয়ে নেমে পড়া
দূরান্তে মিশে যাওয়া
তোমার অনন্তর ধ্যানে
মানুষ পরাজিত নয়

যে প্রান্তরে আছে
আবার অন্তরে বাঁচে
সে-মানুষ স্বাধীন
কিছুটা,
ঝড়ের দাপটে
পাখি ও মানুষ সমান,

কারণ, এরা দুজনেই
প্রিয়স্ব রেখে আসে
বাসা-বাড়িতে—
ঠিকানা হারালে
একজনের ডানা হাতের
পাতার মতো জোড় করে
নিসর্গে,
অন্যজন নাম লেখায়
শরণার্থী শিবিরে

২০

সন্ধ্যার অন্ধকার এসে
লাগে পাথরে, পাথর
এসেছিল ওই পাহাড়
থেকে এই উপত্যকায়—
উপত্যকার পাশ দিয়ে
নদী বয়ে গেছে।
পাখি আর আদিবাসী
জন্মের সিঁড়িতে ওড়ে
প্রজাপতি
নিকটেই পাহাড়ের ফাঁকে

ঢুকে গেলো সেদিনের
সূর্য

তারপরেই সন্ধ্যা নামে
একদল উগ্রপন্থী কুপিয়ে
বিনষ্ট করে দিলো
একটি সম্প্রদায়
একটি বালক, পরদিন
খেলতে খেলতে পেয়ে
গেলো তার বাবার লাশ

২১

শেকড়ে চলাছিল যুদ্ধ
কাজেই, বাকলের
আলিঙ্গন মুক্ত বৃক্ষের
শরীর থেকে খসে
পড়ছিল

এই পাহাড়ে, এই বৃক্ষের
গোড়ায় দাঁড়িয়ে, তার
বাকলে গাল রেখে
এক যুবতী অপেক্ষা
করেছিল, কখন আসবে
তার প্রেমিক, আদরে
জড়াবে তারই বাকল

কিন্তু, এই প্রবীণ বৃক্ষের
শেকড়ে টান পড়ছে,
কে বা কারা চোরের
মতো এসে ধীরে
মাটি থেকে শেকড়
আলগা করছে,
ছোট ছোট হাতে
বড় বড় খুনে, গাছ
নদী ও মাটিতে
ধস নামাচ্ছে,

ঐ যুদ্ধের নিয়মই
এই, প্রথমে পাতাঘরে
রান্না ফুরিয়ে যাবে
শুকনো পাথরে
ঠকাস করে পড়বে
শাখা-প্রশাখা,
তারপর একদিন গোটা
গাছটাই অসভ্যতার
গায়ে হেলে পড়বে
যার আর কোন
শরীর নেই, প্রত্যাঘাত
ছাড়া

২২

একেকটা ঘর থাকে তার
নিজস্ব বাতি নিয়ে
নিজস্ব অন্ধকারে আলো
জ্বালে কেউ, তখন
সদর্পে সকাল হয়

মাঝরাতে এই রকম
সকালে দুঃখে ফেটে
পড়ে কোন বিবেকশীল,
তারপর, আরেকটি
বিবেকবিতর্কে জড়িয়ে
পড়ে দেখে
তার আত্মবিশ্বাসে
ফাটল ধরেছে কিনা,
ভালো মানুষের শুভদৃষ্টি ছাড়া
কোন গরাদেও
আলো জ্বলে না

২৩
নিরুচ্চারিত আত্মনাশা
খেলা, যাবে সামনে
পেছনেও দেখতে হবে
কতোদূর গেছে হাত ও পা

তোমার বিবেক পুড়ছে,
মন শক্তিশালী হচ্ছে
অভিজ্ঞতার ভেতর,

এতো সব থেকেও
উচ্চারণ না-আসে
মুখে, তবে বলবো
যুক্তি দিয়ে বাগানের
মালিকে রাজি করানো
যায়, ফুলকে বলা
যায় না কার জন্যে
ফোটো,

প্রকাশ ছাড়া, প্রতিবাদ
ছাড়া নিজের হৃদয়
মরে হৃদয়ের ভারে

শেকড়ে ঘুন, আর
শাখা-প্রশাখার ফল
এদুটোই চিনেছে বাকল,
চামড়ার লাবণ্যে সাড়া
তুলে ক'দিন বাঁচা
যায়, মানুষের
চোখে জল
বুকে জল
শেকড়ে ঢালার মতো
চাই ঘিলুর সার
'গণতন্ত্র' বুলিটাই
এখন হয়ে গেছে
অপসংস্কৃতি,

মৌলবাদের ডাল
ভেঙে তাড়া করছে
মৌলিক বনমানুষেরা

২৫
শব্দবন্দী নয়, শব্দমুক্তিও
নয়—শব্দকে চাই
নিজের মতো বাঞ্জনা,
নিজের সন্তানের মত
প্রিয় থাকে কিছু কথা

অনুভূতি ছাড়া
কোন সান্নিধ্য টেকে না

পাহাড়ের ফাটলেও
তৃণ জন্মায়, মানুষ
তৃণমূল নয়, জেগে
উঠে সকলেই ডেকে
বলতে চায় 'বাঁচো
বাঁচাও এবং বাঁচবো'

ঘরের জড়তা ঠেলে
চলে এসো শব্দবাণ

২৬
অন্নমেলায় জমেছে
থালার পাহাড়,
বাচ্চারা বুকের দুধ
ভুলে মায়ের মুখে
তাকিয়ে থাকে,
ভারতের জন্যে মেলা বসেছে
সরকারী প্রাঙ্গনে—

স্পন্দন, জুলাই ১৯৯৩

আয়রে তোরা সুবোধ
বালক, স্বপ্ন দেখা
ভুলে যা, এখন তোরা
ভাত কেড়ে নে, হাতে
তুলে নে দুধের
খালি পেকেট,
একটা দুধের গাড়ি
এসে থামলো প্রাঙ্গনে,
দুধ ভুলে গড়িয়ে
পড়লো মিলিটারীর
কার্তুজ,

যুদ্ধ হচ্ছে কোথাও

২৭
বুকে ফোটে চিত্ররূপ,
যে-বুকে সূর্য ঢোকে
তার ভয় কী, সে ছবি
আঁকে রসদ পায়,
মাটিতে বসে শেকড়
খোঁজে, অস্থির সময়ে
ঝরাপাতার বৃক্ষগুলি
তার তুলিতে আসে ভালো

২৮
ক্ষুরের ধারে কাটছে
কথা, যে-বলে
'প্রতিবাদ' কথার কথা নয়
তাকে তুমি কী ভয় দেখাবে ?
দিনের শেষে দীনমজুর
ভরে না শর্ত, অর্থক্ষত
বেড়েই চলে,—তাকে
তুমি যতোই বোঝাও
ভালো, সে কাটে যে তার

কথাতেই, সেটাই ভাবো আগে

তোমার মতো শিল্পীকং
পেলেই ঢুকে যায়
খোলের ভেতর সে,
কারণ, মনের কথা বোঝার
মতো সময় দাও নি
তুমি তাকে,—তবে ?

দিনমজুর সে নয় কখনো
দীনমজুর, সেটাই তুমি
ভয়ে বলো না, কারণ তুমি
চামচেসাধক মধ্যবিত্ত
ক্ষুরের ধার বুঝলেও বুঝতে
পারো, কথার ধার অন্যরকম

২৯
সাঁতার না-জানলে
জল সরল নয় মোটেই,
বরং, পাথর খুব সরল
ও সোজা, মূর্তি বানাও
প্রাসাদ গড়ো, কিংবা
ছুঁড়ে মায়ো সরলকে
তবুও তার থাকে সোজা
মানে,—
হিসেব ক'রে প্রেম করো
তারও এক কণা ফুলের
দাবী থাকে,—
কিন্তু তুমি যে বললে ঃ
মরা মানে সহজ, বাঁচা
মানে কঠিন,
আসল কথা অন্যরকম ঃ
শুভবুদ্ধির জোরেই সাঁতার
শেখে মানুষ,

জল-পাথরের পাহাড়
ভেঙে, নদীর উৎস মুখে
যেতে পারছে যে—

তাকেই বলি লড়াই,
তাকেই বলি : আমরা
বাঁচি আদিম থেকে
অধুনা, দেবো বলেই
ছড়াই, এবং হারাই কিছু দামী

৩০

কিছু ভাঙছে মনের
ভেতর ? তবে আসলে
টান পড়েছে
সুদে-মূলে জীবন, এক
ফোঁটা দুধের বাচ্চা
সেও দাবী করে রোদ
খোলা মুখ আর
এলেবেলে হাসির মানুষ
কিছু বিশ্বাস আঠার মতো
লেগে থাকে কারোর গায়ে
যেভাবেই নাম লেখো না
তার শরীরে

তুমি যে বিনিময়প্রধান
সেটাই যাপনী জীবন

৩১

হাতে জোর হোক, সিঁড়ি
ধস নামলে
ঝুলে থাকতে হবে
নীচের দর্শক ক্লাউন
ভেবে করতালি দেবেই,
তাই ব'লে তোমার কি
পায়ে জুতো নেই ? থুতু
নেই মুখে ?
ছুঁড়ে মারো
পড়ার আগে

৩২

গন্ধ আসছে, গন্ধ ক'রে
অনুভূতি ফোটার গন্ধ

বিকেলে ঝিলের ফুল
তুলছে বালিকা, ভুলছে
বাড়ি ফেরা, গাইছে গান
মনের মতো এক বালক
থাকে মর্মে, উদাস
হলে সে নিজেই বাজে
খেলার ছলে

ঝিলের বুকে দেখছে সে
বালক শুধুই শাপলা
খোঁজে, জল ছিঁড়ে ওই
উড়ে আসছে তার আঁচলে
খাদার রঙে সন্ধে এলো
বালিকার ঠোঁট ফেটেছে ;
বেরিয়ে এলো 'বন্ধু গো,
এক দুটো শাপলা থাক,
কালকে এসে নিয়ে যেও,
হাত মেলছি, উঠে এসো,
উড়ে এসো আমার মুঠোয়'…

তিনপুরের সহজ কাব্য

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনপুরের গান

একটা পুরে আকাশ থাকে, অন্যপুরে মাটি
পাতাল জুড়ে তৃতীয় পুর, তপ্ত এবং খাঁটি

একটা পুরে মহাসাগর, জলের ভেতর পাহাড়
অন্য পুরটা মাটির ওপর, পাহাড়নদীর বাহার
তৃতীয় পুর বরফঢাকা, তুষারমেরুর সজ্জা—
পায়নি যে ঘর কোনো পুরে! জগতজোড়া লজ্জা!

একটা পুরে চলছে জীবন, পুঁজিতন্ত্রের মন্ত্রে!
অন্যপুরে সমাজতন্ত্র আটকালো কোন যন্ত্রে?
সামন্ত আর পুঁজির তোড়ে, আমরা আছি আরেক পুরে
খুঁজছি কেবল হন্যে হয়ে কোনটা গণতন্ত্র!

এ পোড়া দেশ, কেমন দ্যাখো, তিনটে পুরে ভাঙা
একটা পুরে উড়ছে টাকা, ভীষণরকম চাঙা!
দ্বিতীয় পুর নরমগরম, পাচ্ছে কিছু অর্থ
আমরা আছি তৃতীয় পুরে, নিরর্থক অনর্থ।

আমাদের এই তৃতীয় পুরও তিনভাগে বিভক্ত
একটা ভাগে পাহাড়িরা, উপজাতির রক্ত
অন্যভাগে 'জাতি'র দম্ভ, খেলছে সর্বনাশা
আমরা সবর শেষ ভাগে তা মিলনেরই ভাষায়।

এই মিলনও শেষ কথা নয়, তারপরও তিনভাগ
একভাগে 'মালঞ্চ নিবাস', অন্যভাগে রাগ
তৃতীয়ভাগের মালঞ্চ সব আমলে টঙঘর!
এইভাবে ঠিক টিঁকেই আছে অসাম্য বর্বর!

মে, ১৯৯৩

বৃষ্টিপাত

অন্যকোনো জায়গা থেকে এই ত্রিপুরাকে আর
সম্ভব নয় কারু বোঝা
এখনও সে ছিন্ন থাকে, তাই আর ভিন্ন সমাচার
পাহাড়ের বৃষ্টিজল ভাসায় প্রবল সমতলে
ছুটে যায় মানুষের দুঃখের বোঝাবুঝি
বড়ো সোজাসুজি জল পাহাড়ের গা-ছুঁয়ে অনাবৃষ্টি সমতলে নামে
তলে-তলে জল যায়, মাটিরও তলে ও অতলে
মানুষ ছুটতে থাকে এদিক-ওদিক ডানেবামে
তলে-তলে কেউ-কেউ শক্ত হয় মনের শেকড়ে
কান্নায় জমে-থাকা রাবারগাছের রস গলে গিয়ে টুপটাপ পড়ে

ত্রিপুরা নিজেই নাচে তিনপুরের গান গেয়ে তাথৈ তাথৈ
অন্য বৃষ্টিজল আসে, সমস্যার অন্নজল বুঝে নেয় মানুষ আবার
মাঠে আসে নতুন দিনের শস্য, আবার আনন্দশিশু করে হৈ-চৈ
ভেবে নেয় ঋতুরঙ্গের কথা, মানুষ-প্রকৃতি নিয়ে যা ছিলো ভাবার —
সমতলবাসী জন তখন পাহাড়ে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে যায়
পাহাড়ি মানুষ সব সমতলে বৃষ্টি হয়ে নিজেকে মেলায়
মানুষের ধারাপাত এইভাবে বৃষ্টিপাত গড়ে
এইভাবে কাছে গিয়ে অন্যের মনে কেউ কিছু না-কিছুর সৃষ্টি করে।

মে, ১৯৯৩

নতুন কবিতা যদি চাও

নিজের ভাষাতে বেশ খোলাখুলি বলবো কথাটথা
নেবো না সাজানো শব্দ কবিতায়, অকথা-কুকথা।
বলি না যে-শব্দ আমি কোনোদিন মানুষের সাথে
অযথা কেন সে শব্দ ব্যবহার করবো এ হাতে !
চার-পা থেকে দুই পা বদলে গিয়ে হয়েছিলো মানুষজনের এই হাত
হাজার বছর জুড়ে বহু শ্রম বিনিময়ে হয়েছিলো এই বাজিমাৎ—
সেই শ্রম পণ্ড হবে কেন এই হাতের কলমে
পণ্ডশ্রম ক'রে কেন এই হাত লেপ্টে যাবে সাজানো মলমে ?

শব্দের ভাণ্ডার ঠিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মানুষের মুখে
কারুর কলম যদি আশ্রয় খুঁজে পায় তাদের সুমুখে
ভালোবাসে ভিতরজীবনকথা, যদি পায় পরম আশ্রয়
কবিতার ভাণ্ডারে থাকবে না শব্দের অভাবজনিত কোনো ভয়
শব্দের ব্যঞ্জনা পাবে ঠিক নতুন মাত্রার কোনো পথ
এইখানে শুরু হোক সহজ পাঠের কাব্য, কবিতার জন্য অন্যমত
জোর করে চাপানো যা কাব্যবিচারধারা, মূল ধরে উপড়ে ফেলে দাও
মানুষের কাছে গিয়ে শব্দভিক্ষা করো, নতুন কবিতা যদি চাও।

মে, ১৯৯৩

রাণী গুইদালোর সোজা কথা

[সদ্যপ্রয়াতা স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরাঙ্গনাকে মনে রেখে]

রাণী গুইদালো
রাজবাড়ি ছেড়েছুড়ে যখন পালালো
ফিরিঙ্গিরাজের সাথে তারপর হয়েছিলো দারুণ লড়াই
তাঁর এ স্বাধীন গান উত্তরপূব জুড়ে এখনও ছড়াই
তাঁর নামে ছড়া কাটি উত্তরপূব থেকে অন্যসব দিকে
স্বাধীনতাযুদ্ধের সোজাসুজি পাঠ নিই রাণীর নিরিখে
রাজার প্রাসাদ ছেড়ে, বিলাসের স্বাদ ছেড়েছুড়ে
কী ক'রে রাণীও যায় ব্রিটিশের দিকে তেড়েফুঁড়ে
শ্রীহট্টের শ্রীঘর যতোই বিশ্রী হোক ফেরাতে পারেনি তার মুখ
ফিরিঙ্গিরা ফিরে গেলে রাণী শুধু খুঁজে ফেরে মানুষের সাহচর্য সুখ
নাগাদেশ মণিপুর নানাপুব খুঁজে চলে রাণী
তাঁকে শেষে শান্তি দেয় নুঙকাও পাহাড়ি বনানী
সেইখানে গুইদালো গড়ে তোলে নিজের কুটির
নিজস্ব সে কুটিরেই অধীর জীবন থাকে স্থির

গ্রামের মানুষজন তাঁর কাছে জীবন্ত ইতিহাস শোনে
কী ক'রে স্বাধীন হবে, মূল অর্থে, কিসের কারণে
মূল অর্থ বের করো, তবেই মিলবে কিছু দিশা
অন্যথায় থেকে যায় দিগ্বিদিকের অমানিশা।

মে, ১৯৯৩

অনৈক বিজ্ঞ কবির সুবচন : নবিশি কবির প্রতি

কবিতায় আনো বেশ রহস্যটহস্য
তোমাকে হতেই হবে বিশুদ্ধ কবি !
তোমার পদ্যোটদ্যো, বাছাধন হে
জলবৎ তরলং হচ্ছে যে সবই !
লিখছো তো কবিতার ভস্ম :
কবিতার নামে লেখা সহজ কথার পরামর্শ।
এসব তো চাঁছা-ছোলা ভাষণ-টাষণ
ময়দানে নেমেটেমে বরঞ্চ পাকা করো নিজস্ব নিশ্চিন্ত আসন
সেটা তবু ভালো
শব্দও জুটে যাবে চোখা-চোখা জোরালো-সোরালো
এসব না-করে কেন শুধু-শুধু ভস্মে ঘি ঢালো !

এখনও সময় আছে, সাবধানবাণী তুমি শোনো
সমাজে কী হোলো না-হোলো
কবিদের তাতে অসে যায়নি কখনও।
যদি হতে চাও কবি, পেতে চাও কবির শিরোপা
অত্যাচার-টত্যাচার দেখলেই বনে যাবে অন্ধ ও বোবা
পদ্যের উদ্যানে কক্ষণও চলবে না বাদ-প্রতিবাদ
সমাজ-টমাজ-কথা বাদ দিয়ে কবিতাকে হতে হবে নিখুঁত নিখাদ
কাব্যজগৎ জুড়ে থাকে শুধু নরমগরম কল্পকথা
এ জগৎ নোংরা করে রুখাশুখা মানুষের বাস্তবতা
যদি বা কখনও আনো বাস্তবতার কিছু খেল্‌
রহস্য মিশিয়ে তাতে কবিতায় মারো 'ককটেল' !

তুমি কি জানো না বৎস
সমস্ত দুনিয়াটাই হয়ে আছে রহস্যকাহিনী
তাইতো উল্টেপাল্টে খাই শুধু ভাজা মৎস্য
ঠেকে শিখে কবিতাকে রহস্যই মানি।

জানুআরি, ১৯৯৩

আজবপুরের নতুন কথা

আজবপুরের রাজধানী এই নতুন আগরতলা
এখন আছে মাটির ওপর, ছিলো জলের তলায়
আগের কথা নাহয় আমি বলবো আরেক সময়
নতুন কথা বলতে কিন্তু চাইছি কিছু অভয়!

১

কাকড়াবনে কাঁকড়ার দাঁড়া
মানুষের লাশ পোড়ে
আগরতলায় আগরবাতির
গন্ধেই মাথা ঘোরে!

২

গর্জি' যাওয়ার বাসের ওপর
গর্জায় রাইফেল
মানুষ কাঁপছে আগরতলায়
গুন্ডাভজার খেলু!

৩

বিলোনীয়াতে ঘরবাড়ি জ্বলে
চলে গুলি, চলে টাক্কল
আগরতলার আক্কেল চেপে
কেউ খোঁজে নিজ মক্কেল!

৪

চড়িলামে কোন উপজাতি গ্রামে
দাঙ্গার কী কাহিনী!
আগরতলার শহর চালায়
মাস্তান-ই-বাহিনী!

৫

ধর্মনগরে ধর্মের কল
বাতাসে এখন নড়ছে না!
আগরতলার আইনের পতি
চুপচাপ! কিছু করছে না!

৬

জিরানীয়াতে ছাত্রের হাতে
পিস্তল-বোমা-ছুরি,
আগরতলার বন্ধুরা করে
প্রশ্নপত্র চুরি।

৭

নারীমাংসের শিকারীরা ঘোরে
উজানে ময়দানে
আগরতলার 'প্রতিবাদী', ডোবে
কিসের মদ্যপানে ?

৮

বীরচন্দ্রমনুর বুকেই
পড়ে আছে কতো লাশ !
আগরতলার শিক্ষককুল
খেলছে বাহারি তাশ !

৯

মনুর বাজারে আন্ত্রিকে মরে
মনুরই তো সন্তান।
আগরতলার গায়কের দল
গাইছে উল্টো গান।

১০

গরীব পাহাড়ি পেটের জ্বালায়
লতাপাতা করে সিদ্ধ
আগরতলায় অমরা কজন
বিবেকের তীরে বিদ্ধ ?

আজবপুরের অবাক কথা বলবো কতো আর।
বন্দনা গাও আজবপুরের, জুটবে পুরস্কার॥

জুন ১৯৯২

দুই রকম

কে কাকে ভরিয়ে দেয় আদরে-আদরে

সমস্ত মাঠঘাট অরণ্য প্রান্তরে
ফেটে পড়ছে হিংসা-রিরংসা
শ্রেষ্ঠ প্রাণীকুলে চলে বিচিত্র জিঘাংসা !

এখন মানুষের অন্য কোনো নাম নেই
কিছু না-কিছু সামলেই
এ ওর পিণ্ডি চটকায়
কারুর কি কিছুতে আটকায় ?
কোনো খটকাও নেই কারো আজ
সকলের সবকিছু পরিষ্কার, নিপাট নিভাঁজ···

এরই ভেতর একে অন্যের হাত ধরে
যে-কোনো ঘূর্ণিঝড়েরও ভেতরে
শুধু কিছু গরীব-গুর্বো মানুষ, বোকাশোকা
তাদের নিয়ে বই ভরে যায় লেখাজোকায়—
তারা পড়ে থাকে এধারে-ওধারে
বুদ্ধিমান কবির সামনে শহরে বাদাড়ে

কীভাবে কি যেন সব তারা করে
একে ভরে যায় অন্যের আদরে।

নভেম্বর, ১৯৯১

যে মানুষ কখনও মরে না

শংকর গুহনিয়োগীর হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে

ছত্তিশগড়ের বুকে পড়ে আছে মানুষের শব
সেই মানুষের দেহ শেকড়বাকড় আর ডালপালা মেলে বারে বারে
কার ধ্বংস চেয়েছিলো কিছু কাপুরুষ অবয়ব
জানে না, মানুষ কেউ বাঁচে লক্ষ মনের দুয়ারে।

অক্টোবর, ১৯৯১

গণতান্ত্রিক লুঠেরা

দেশনেতারই মৃত্যুতে হায় শোকের বাহার কেমন দ্যাখো
পাঁচশো বাড়ি পুড়লো রাজ্যে যত্রতত্র
পোড়ার আগে লুঠ হয়ে যায় বাড়িঘরের জিনিশপত্র—
গণতান্ত্রিক লুঠেরার স্বাদ কেমন চাখো !

মে, ১৯৯১

ফুটে ওঠো

১

ফুটে ওঠো
চাঁদের আলোয় বৃষ্টির ভেতর গ্রীষ্মের দাবদাহে
ছোটো ছুটে বেড়াও যেখানে সেখানে
মহাকাশ জুড়ে থাকা অণুপরমাণুর প্রবাহে

ওঠো যাও সমস্ত উষ্ণতায় শীতলতায়
যাও
হিমবাহে নাতিশীতোষ্ণতায় অগ্নিগিরিতে
যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে স্বর্গের সিঁড়িতে

২

যাও
খেয়ে ফেলো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তবু অনাহার
স্বীকার কোরো না তুমি কোনো করুণার
পাত্র নও হয়ে ওঠো চলন্ত পাহাড়।

আদিম অনাহার থেকে রাশিরাশি শস্যদানায়
ফুটে ওঠা তোমাকে মানায়

যাও তুমি
সেখানেই ফুটে ওঠো।

মার্চ, ১৯৯০

কারণ ব্যাখ্যান

আমার হাতে দ্যাখো যদি ঝাণ্ডা
তুমি তো আগেই ঝাণ্ডাধারী—
হাতে যদি দ্যাখো কোনো ডাণ্ডা
তুমি যে আগেই ডাণ্ডাধারী !

একহাতে তালি বাজে না
খালিপেটে কথা সাজে না ।

জুন, ১৯৮৯

মনুর সন্তান

[ত্রিপুরার বীরচন্দ্রমনুর সাত শহিদের কথা মনে রেখে]

কেউ কি জানে না -

বীরচন্দ্র মনুর বুকে
বুক ঠুকে
মনুর সন্তান সাত বীর
মানুষের জন্য শুধু হয়ে গেছে স্থির
তাদের নিটোল গান মিশে আছে আকাশে বাতাসে
মিশে আছে পাহাড়িয়া ঘাসে

পাশাপাশি কোন ত্রাসে সন্ত্রাসে
চুপ থাকে মানুষজন
এমন কি, পাখির কূজন
থেমে যায়
নেমে যায় মানুষের সামাজিক বোধ
অবোধ
শিশুর মতো এ তাকায় ওর দিকে
যেনতেন নিজেরই মাথাটিকে
ভোঁতা ক'রে দিতে চায়
পালায়
হৃদয় ছিঁড়ে
কোন ভাঙনের তীরে
নিজেই জানে না···

তবে তুমি কোনদিকে যাবে ?
কোনভাবে গেলে হারানিধি ফিরে পাবে ?
তুমি কি গো মনুর সন্তান ?
আকাশবাতাসে শোনো ভেসে আসে মানুষের গান—
তোমাকেই প্রশ্ন করে এ গানের সেই সাত পাখি
সন্ত্রাসে বিহ্বল হয়ে তোমার নিজের কাছে কতোটুকু অপমান বাকি ?

নভেম্বর, ১৯৮৮

কে যে

[ত্রিপুরার উজ্জান ময়দানে সদ্যঘটিত পাশবিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়]

এখনও কে যে অন্ধকারে আলোর রোশনি খোঁজে
এখনও কে যে সোজা কথাগুলি সহজভাবেই বোঝে
এখনও কে যে ভাবে দাবানল উৎস ধরছে তুষ
এখনও কে যে নানান আফিং খেয়ে থাকে বেহুঁশ !

এখনও কে যে ময়দান বেয়ে উজ্জানের পথে যায়
এখনও কে যে কাঁদে লুণ্ঠিত শরীরের বেদনায়
এখনও কে যে বোঝে রমণীর শরীর অপাপবিদ্ধ
এখনও কে যে দাবী ক'রে চায় সুবিচার, যা নিষিদ্ধ !

১০জুন, ১৯৮৮

শেকড়

শেকড় নেই তোমার কিছু?   তোমার শেকড়বাকড়?
পোকামাকড় খাচ্ছো শুধু, ভাসতে-ভাসতে যাচ্ছো
ভাবছো তোমার বিকল সময় কোনো ধকল সয় না
তবে যে ওই মাঠের ধান্য, দিচ্ছে তোমায় পরমান্ন
অর্জুনফুল নিয়ে পাহাড় হাসছে মিটিমিটি
রয় না এখন কেউ ঘরে আর
নাচছে বাহার মাটির পাহাড়
তোমার চলনবলন দেখে দিচ্ছে সবাই ঢি ঢি!

কবে তোমার চোখ দিয়ে সেই জল গড়িয়ে পাথর!
পাথর, তুমি পাথর!

মে, ১৯৮৮

খোঁজাখুঁজি

তার দাঁড়াবার জায়গা ছিলো না
পা-বাড়াবার জায়গা ছিলো না—

এখন খুঁজছে মাটি
এখন দেখছে মৃত্তিকার ওই চরম খুঁটিনাটি
সেই মাটিতে আকাশছোঁয়া গর্জন সার-সার
ভাঙছে পাগল এ পাহাড় ও পাহাড়।

গর্জনের ওই আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে ঢের
কী যেন সব কইছে বাতাস, ঢের পেয়েছে টের
তারই জেরে ঝুঁকলো পাগল, মাতাল পায়ের মাটি
সেই মাটিতে এঁটেসেটে বসলো পরিপাটি
পাথর-ক্ষওয়া মাটি এসব, পাথর-ক্ষয়ে মাটি
বুঝছে এবং যুঝছে পাগল, দারুণ খাটাখাটি।

মাথার ওপর গর্জন মেঘ রাগ করেছে ভীষণ
রাগ করেছে দেবতামুড়া পাহাড় জুড়ে বিষম
বিষম-ভীষণ রাগারাগির মধ্যিখানেই সে
শেষমেষ কাজ সমঝে নিতে কোমর বেঁধেছে—
কোমরবাঁধা কাজের ভেতর পায়ের তলার মাটি
খুঁজছে পাগল উথালপাথাল, গড়ছে নিজের ঘাঁটি
সেই মাটিতে মিলছে নিজের স্থির দাঁড়াবার ভাগ
পা-বাড়াবার জায়গা পেয়ে ঘুচছে ভীষণ রাগ।

এপ্রিল, ১৯৮৮

ইতিহাসের পাতা ওড়ে ত্রিপুরায়, সারা দেশে, দেশে-দেশে

১

ত্রিপুরার তারা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক
তাদের নামে কেচ্ছাকাণ্ড নেই।
যাত্রীবাহী বাসের ওপর স্বেচ্ছাসেবী গুলির বৃষ্টি
তাদের নামে কেচ্ছাকাণ্ড নেই!

গরীব পাহাড়িদের তারা স্বেচ্ছা-পথপ্রদর্শক যে!
তাদের নামে কেচ্ছাকাণ্ড নেই।
অন্যমতের লোকজন সব স্বেচ্ছাসেবী টাকাল খায়
তাদের নামে কেচ্ছাকাণ্ড নেই!

দরিদ্র কীর্তনের দলও দুপুরে শামিয়ানার তলে
স্বেচ্ছাসেবার আক্রমণে লুটায় কাদার জলে
মায়ের রসকলির ফোঁটা পিতৃহারা শিশুর বুকও
রক্ত হয়ে ভাসায় পলে-পলে!

এমন সেবকদলেয় নেতাও, আমন্ত্রণ পায় রাজার কাছে
নেতার এখন মানুষজন নেই, সঙ্গে শুধু রাজাই আছে
রাজার আছে নিজের কোটাল, নিজস্ব সামন্ত আগে
আপাত মন্ত্রীত্ব ঠিকই জুটবে সেবকনেতার ভাগে!

২

এবং তারপরে রাজা জড়ায় যদি নিজের জালে?
তোষামোদের সব পারিষদ পালাবে ঠিক পালে-পালে।
দেশে দেশে এমন দৃশ্য, দেখছি আমরা নানান যুগে
খিদের সুযোগ নিয়ে নেতা মাতায় মানুষ কোন হুজুগে!
নেতার আপোষ রাজার সাথে, মানুষ থাকে সেই নিরন্ন
ক্ষমতার কোন দম্ভে রাজা, মানুষকে স্রেফ বানায় পণ্য!
বোঝাবুঝির বাইরে রাজা, তার শ্রীচরণ নেতার সাথে
মানুষজনের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানানোতেই মাতে···
তখন আসে বিদ্রোহীরা, মরণখেলায় শঙ্কিত নয়
ইতিহাসের পাতায় লেখে এমন বিদ্রোহীদেরই জয়।

জানুআরি, ১৯৮৮

চোখ খোলো

শরীর জুড়ে লবণমাখা রক্ত
শরীর জুড়ে লবণমাখা জল
আমরা তবে কেমন নিরাসক্ত
সবাই যখন খোঁজে বুকের তল
তখন যায়, যে যার কাছে যায়

চোখ বুঁজে থাকা তোমার কি শোভা পায়!

জুন, ১৯৮৭

পথ

১

সকাল থেকে দাঁড় বাইছি ঠায়
পেট চেপে আছি তারই অপেক্ষায়
এমনকি এই শূন্য দুপুরও 'যাই না যাই না' ক'রে
মিশে যেতে থাকে বিকেলের এ জঠরে
পেট চেপে তবু দাঁড় বাইছি ঠায়
তারই অপেক্ষায়।

২

এখন আসে নিকষকালো হাওয়া
সকাল থেকে পেট চেপে দাঁড়-বাওয়া
এইবার শেষ হোলো
এখন তো খিদে ভোলো
রজনীগন্ধার পাঁপড়ি শাদা-শাদা
জোগাড় রয়েছে হাতে বেশ গাদা-গাদা
এই আমাদের প্রচুর খাবার-দাবার
মুহূর্তে করো সাবাড়।

৩

আমাদের এই ক্ষুধার্ত পেট বোঝে
শরীরের কাছে ফুলের আকুল গন্ধ
আমাদের সব ক্ষুধার্ত পেট খোঁজে
কোনপথে থাকে ভরাপেট আনন্দ!

মার্চ, ১৯৮৬

ভিন্ন রকম

কেউ কিছু কম বোঝে
কেউ বোঝে অতিরিক্ত বেশী
কেউ দেশী সুরে গায়
কারো সুর শুধুই বিদেশী

মাঝখানে বুঝে থাকে কেউ-কেউ
দেশীয় সুরের সাথে কেউ আনে বিদেশীয় ঢেউ।

মার্চ, ১৯৮৭

রক্তের রঙ কমলা

তিনপুরের পাহাড়ের এই আকাশে
কি বিচিত্র রঙের ছুটোছুটি
যেন শরীরের সব রক্তের লুটোপুটি
রক্তের রঙ বদলায় আশেপাশে
আকাশের ছাতে, আকাশে-আকাশে
এই বাতাসে এই মাটিতে
পাহাড়জোড়া কমলাবনের ঘাঁটিতে।

জম্পুইবনে কমলালেবুর ঝাড়
সবুজ-লাল-হলুদ হয়ে যায়
মাটিতে মেলায়, আকাশে মেলায়
কমলারঙের রক্ত শরীরে কার ?

কমলা চাষ-করা হাত বেয়ে ধীরে আশেপাশে
রক্তের লাল রঙ চুপি-চুপি বের হয়ে আসে
তারপর সেই রক্ত হয়ে যায় কমলার রস

জম্পুইবন জুড়ে কমলালেবুর কাছে এইভাবে রক্তের যশ।

নভেম্বর, ১৯৮৬

অঙ্গভাগে

অঙ্গখানি বদলাতে চান, হবেন নাকি বিহঙ্গ
কিন্তু আকাশ থেকে পতন, হয়ে গেলেন ত্রিভঙ্গ
একভাগে মশকরা থাকে, আরেক ভাগে রাগ
বাকিটুকু ভালোবাসার দখলদারি ভাগ।

জুন, ১৯৮৬

পূর্ণ আলোকচিত্র

ছেলেংটার ন্যাংটো শিশুর কোমরে কোনো ঘুণ্সি নেই
উদোম পেটে হরেকরকম শব্দ
খবরের সব কাগজ জুড়ে ফোটোগ্রাফির মুন্সিয়ানায়
খিদেও বেশ কেমন থাকে জব্দ !

এপ্রিল, ১৯৮৫

সময়ের হেরফের

আগে ছিলেন বিদ্রোহী খুব
এখন বড়ো মন্ত্রী
এখন মারেন বিদ্রোহীদের
তিনিই গণতন্ত্রী !

আগস্ট, ১৯৮৪

অবস্থা যা

ঠোঁটকাটাদের কথায় এখন কার কী যায় আসে ?
চতুর্দিকে কানকাটা সব রাজার কোঁদল
রাজার গণতন্ত্রে কেবল পোশাক বদল
উদ্‌ভ্রান্ত সব মানুষ শুধু তাকায় আশেপাশে।

মার্চ, ১৯৮৪

টেলিভিশন

যেমন আছো তেমন থাকো
দরকার কী অন্যকিছু ভাবার !
ভাবতে গেলেই ঘাড়ে পড়বে থাবা
বোকাদের বাক্সে বরং ঢুকেই থাকো।

জানুআরি, ১৯৮৪

টীকা : কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতার সাথে বেশ কয়েকটি কবিতা এখানে পুনর্মুদ্রিত হোলো। —সম্পাদক, স্পন্দন

আবু আলেহ মুসা

দুটি কবিতা

আদিমকাল

জারায়ুর ভেতর বেড়ে ওঠে আদিমকাল।
যেমন মাটিতে বড় হয় গাভীর দুধ ঘাস
আনারস ফলের মাঝে ডুবে থাকে ফুল
মাথায় আগামীকাল।

এসব কেনো রহস্য নয়
এ এক বিবর্তিত আদিম সত্ত্বা
বাইরে এবং ভিতরের পরম বিবরে
আবর্তিত ব্যতিক্রম।

তবে আমরা গাভীকেই চিনেছি বড় বেশী
মাটিকে বুঝিনি কখনো
তাই অকৃতজ্ঞের মতো ভূমিষ্ঠ হই
বার বার।

২.৬.৯৩

গোলমেলে বাতাসা

মিথ্যার থুথুতে প্লাবন ঘনিয়ে
ডুবে যায় শব্দগঠিত আকাশ,
স্পষ্ট আলোয় প্রতিনিয়ত চিবিয়ে খাই
গোলমেলে বাতাসা।

বুক থেকে যা শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়
শরীরকে, মা'কে এবং শিশুকেও।
স্বপ্নের কাছে জানু পেতে বলি : আর নয়।
ইচ্ছার কাছে বলি : বড়ই ক্লান্ত।
বেদনার কাছে বলি : আমি প্রস্তুত।
তোমার কাছে বার বার বলি : আমি ঠিক মানুষটি নই।

তথাপিও—
অভিনয়ে ভিত্তিপ্রস্তর
গা লেপ্টে আঠার মতো লেগে থাকে
যুগ যুগ।
চালাকি ধরে রাখে
ঘন ঘন ঘুম ভাঙা চিৎকার
বিপুল বাঁশীর সুরে বেজে ওঠে
শব্দ বন্ধনী।

১৮.২.৯২

ভারতীয় জেলখানার চালচিত্র : অন্য পর্ব

মীনাক্ষী সেন

মিতাকথন

যারা কলকাতার কাছাকাছি শহরতলি অঞ্চলের উদ্বাস্তু কলোনীগুলোকে দেখেছে —তারা মিতাকেও দেখেছে, আমি জানি।

রোগা, কালো, ছোটোখাটো, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার এক মেয়ে। চুলে এক বিনুনি বেঁধে সকালবেলা আটটার মধ্যে কাজে বেরিয়ে যায়।

অত সকালে কোনদিন খাওয়া হয়—কোনদিন হয় না। কোনদিন কপালে একটি টিপ-পরা হয়ে ওঠে—কোনদিন হয় না। কোনোদিন পরনে থাকে দিদির সস্তা দামের ছাপা শাড়ি। কোনদিন নিজের একটি মাত্র স্কার্ট-ব্লাউজ। কাঁধের সস্তা দামের ব্যাগে অ্যালুমিনিয়ামেব টিফিন কৌটোয় থাকে দুটি রুটি, একটু গুড় বা আলুভাজা।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ওর যখন রাত আটটা বেজে যায় তখন বেড়ার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে একটি মুখ। কোনো কোনো দিন আটটা পেরিয়ে রাত নটা কি দশটার দিকেও চলে যায়। সেদিন অপেক্ষারত সেই মুখে ফুটে ওঠে উদ্বেগের রেখা। ব্যস্ততায় পায়চারি করে সে। বারবার আঁচলে মুছে নেয় কপালের উদ্বেগের ঘাম। চোখ রাখে রাস্তার দিকে।

সেই মানুষটি মিতার গর্ভধারিণী জননী নয়। সে মিতার দিদি, মিতার চার বছরের বড় দিদি।

কি যেন নাম মিতার দিদির ? মিতা বলেছিলো--কিন্তু মনে থাকে না। নাম মনে করতে গেলেই মনে হয় ও নীতা। কারণ উনিশ বছরের সেই মেয়েটিই তো টানতো সংসার।

সেই পরিচিত গল্প। দেশভাগের এক বলি। পূববাংলা থেকে উৎখাত হয়ে আসা ছিন্ন মূল এক উদবাস্তু পরিবার।

অবশ্য পূববাংলায় নীতার বাবার রাজত্ব ছিলো না। জমিদারীও নয়। ছিলো বাস্তুভিটা, সামান্য জমি, পেটের ভাত এবং হাই-স্কুলে একটি চাকরি। সে যুগের অনেক আদর্শবাদী মাস্টার মশাইদের মত স্কুল ছিলো নীতার বাবার প্রাণ।

তাই দেশভাগের পরও সেই স্কুল ছেড়ে, আজন্ম পরিচিত বাসভূমি ছেড়ে তিনি চলে আসতে চান নি। তবু শেষ পর্যন্ত আসতে তাকে হয়েছে। ততদিনে বেশ দেরী হয়ে গেছে। তাই আরও কঠিনতর হয়েছে তার কাছে জীবন যাপন।

শেষ পর্যন্ত শহরতলির এক কলোনী-অঞ্চলে ছোটো বেড়ার ঘর তুলে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন। হাই স্কুলের বদলে কলোনীর ছোটো প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। এবং চার কন্যা ও স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অভাব মাথায় করে।

মাথা থেকে সে অভাবের বোঝা নামাতে টিউশনি এবং অতি-পরিশ্রম করেছেন মিতার বাবা। এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এসেছে অকালমৃত্যু।

নীতার বয়স তখন আঠেরো—মিতার চোদ্দ। বাকি দুই বোন নেহাৎই ছোটো।

বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে হ'লো বড় বোন নীতাকে।

যে নীতাকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিলো। মেধাবী নীতা, স্কুল ফাইনাল প্রথম বিভাগে পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলো। ভালো গানও গাইতে পারতো সে। ভালো আবৃত্তি করতে পারতো।

মেয়ে দশজনের একজন হবে—মুছিয়ে দেবে তার ছিন্নমূল অপদস্থ জীবনের সব গ্লানি—এ আশা নিয়েই একদিন হঠাৎ করে চলে গেলেন নীতা-মিতার বাবা।

দয়াপরবশ হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নীতাকে বাবার চাকরিটা দিয়ে দিলো।

সেই থেকে নীতাই টানে সংসার।

সকালে বাড়িতে আসে দু-চারজন মেয়ে। নীতা তাদের পড়ায়। তারপর নাকে মুখে দুটো গুঁজে স্কুলে দৌড়োয়। স্কুল থেকে ফেরার পথে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তিন চারটি অপেক্ষাকৃত দামী টিউশনি চলে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এসে যায়।

বাড়ি ফিরে তাই শুধু ক্লান্তি—বিশ্রাম, খাওয়া আর ঘুম।

আর স্বপ্ন দেখা। নীতার স্বপ্ন মিতা। পড়াশুনোয় মিতা নীতার চেয়েও অনেক বেশি ভালো। গানের গলাও মন্দ নয়। কিন্তু পড়াশুনোতে সে সত্যিই খুব বেশি ভালো।

তাই তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে তার চার বছরের বড় দিদি। খুব বড় হবে মিতা। দেশজোড়া নাম ডাক হবে তার। সেদিন সার্থক হবে দিদির পরিশ্রম। সার্থক হবে তার উনিশ বছরেই ক্লান্ত হয়ে ওঠা অভাবী জীবন।

কিন্তু মিতা যে এক অন্য মেয়ে। দিদির পরিশ্রমের বিনিময়ে সে বড় হতে চায় নি। দিদির ত্যাগে সমৃদ্ধ করতে চায় নি তার জীবন।

তাই স্কুল ছেড়ে, পড়া ছেড়ে, জ্যাম, জেলী, চাটনি, আচার তৈরীর কারখানায় কাজ নিল মিতা। এই ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত পায় মিতার দিদি। বাবা মারা যাবার পরেকার স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশার পর এই দ্বিতীয়বার তার সব স্বপ্ন ও আকাংখা যেন চুরমার হয়।

অনেক বকাবকি, রাগারাগি, কথা বন্ধ। মান-অভিমান ও চোখের জলের পর মিতার বক্তব্য কিছুটা বুঝতে পারে দিদি।

স্কুল ছাড়লেও পড়াশোনা ছাড়ছে না মিতা। বাড়িতে পড়ে 'প্রাইভেটে' স্কুল

ফাইনাল দেবে। তারপর উচ্চ-মাধ্যমিক। স্কুল পাশ হয়ে গেলে সকালের কলেজে পড়বে—দুপুরে চাকরি করবে। কষ্ট হবে। পরিশ্রম হবে। কিন্তু পড়াশুনো বন্ধ হবে না তার। কোথাও কিছু আটকাবে না—দিদি যেন দেখে নেয়।

কিন্তু দিদিকেও এখন থেকে দু-চারটে টিউশনি ছাড়তে হবে। প্রাইভেটে উচ্চ-মাধ্যমিক দিতে হবে। তারপর বি. এ., এম. এ, সব পরীক্ষাই। দুজনে মিলে তারা সংসার টানবে। দুজনে মিলে দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে। দিদির জীবন নষ্ট করে সে নিজের জীবন গড়তে চায় না।

নিজের জীবন তো প্রাইমারী স্কুলের চাকরি আর টিউশনি করতে-করতেই শেষ হবে—ভেবেছিলো মিতার দিদি। বয়স যার উনিশ বছর। তার তো মনেই ছিলো না সে-ও ছিলো মেধাবী ছাত্রী। সে-ও লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে—বাবার স্বপ্ন ছিলো।

বড় হয়ে-ওঠা মিতা দিদিকে আবার সে কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দুই বোনে মিলে সেদিন অনেক কথা হয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা-জল্পনা। বহুদিন পর নিজেকে নিয়েও বোনের সঙ্গে কথা বলে নীতা।

তবুও তার মনে আশংকা থেকেই যায়। পাড়ার স্কুলে চাকরি করেই, সে পেরে ওঠে না। মিতা কি বাড়ি থেকে দূরে—এক কারখানায়, ভুতের বেগার খাটার পর পারবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে ?

* * *

দিদির মন মিতার ভবিষ্যৎ চিন্তায় শংকিত হয়ে উঠলেও খুশী হ'ন অন্য একজন। মিতার গর্ভধারিণী মা।

এই মাকেও কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ দেখেছে—আমি জানি।

তবুও আমাদের গল্পে, গানে, কবিতায় বা উপন্যাসে কিংবা ছবিতে এই মা তেমন করে আসে না কখনো। এই মাকে আমরা লোকচক্ষুর সামনে আনতে চাই না।

মা শব্দে আমাদের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে স্নেহময়ী, মঙ্গলময়ী, স্বার্থ-শূন্য বরাভয় মূর্তি, নিজেদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সুখে বা দুঃখে কিংবা বিপদে আনন্দে যাকে আমরা ডেকে উঠি—সেই মাতৃমূর্তির সঙ্গে এ মায়ের কোনো মিল নেই।

এই মা মিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন না। নীতার জীবন নিয়েও নয়। এই মা বোঝেন, মিতার চাকরি মানে অভাবের সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য। এই মা বোঝেন পাঁচজনে কষ্টে থেকে লাভ নেই। বরং তার দুটি মেয়ের পরিশ্রমের বিনিময়ে অন্য দুটি মেয়ের পড়াশুনো ও জীবন যাপন সহজ হলে সেটাই ভালো।

তাই মিতার পরামর্শে নীতা টিউশনি ছেড়ে দিলে মায়ের মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে। পাছে দিদি আঘাত পায় মায়ের ব্যবহারে—আবার উর্ধশ্বাসে টিউশনি শুরু করে—তাই মিতা ওভারটাইম করতে শুরু করে দিদিকে লুকিয়ে। সংসারে

টাকার উৎস খুঁকিয়ে না-উঠলে মিতার মা খুশী হ'ন। ওভারটাইম করে বাড়ি ফিরতে যে মিতার রাত হয়ে যায়—তাতে তিনি আপত্তির কিছুই দেখেন না।

যদিও বিপদ-সংকুল ছিলো তখন মিতার বাড়ি ফেরার রাস্তাটি। ক্ষমতাশালী গুণ্ডা মস্তান বাহিনীর দাপটে। সেই সময়েই বাড়ি ফিরতে মিতার কোনদিন রাত আটটা হয়ে যায়, কখনো নটা, কখনো দশটাও।

রাত হয়ে গেলে ছোট দুই মেয়েকে খাইয়ে দেন মা। তারপর নিজে খেয়ে শুয়ে পড়েন। বড় দুই মেয়ের খাবার ঢাকা থাকে।

মিতা বাড়ি না ফিরলে দিদি কখনো খায় না ; ঘুমোয় না। কোন কাজে মন দিতে পারে না। রাত বাড়তে থাকলে মায়ের ঘুম যখন গাঢ়তর হয়ে ওঠে, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করে দিদি। কপালে জমে-ওঠা উদ্বেগের ঘাম ঘন ঘন মুছে নেয় জীর্ণ আঁচলে, জানলায় মুখ রেখে পথের দিকে চেয়ে থাকে।

তাই 'মা' শব্দে মিতার মনে যে মুখটি ভেসে ওঠে সে মুখ তার মায়ের নয়। সে মুখ, তার চেয়ে মাত্র চার বছরের বড় দিদির।

* * * * *

তারপর একদিন বাড়ি ফিরে আসে না মিতা। দিদির আশংকা ব্যাকুল আর্তনাদে পরিণত হয়। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে মা-ও সেদিন জানলায় দাঁড়ান।

কলকাতার কাছের এইসব শহরতলিগুলোকে যারা দেখেছেন—তারা এমন ঘটনার কথাও কখনো কখনো শুনেছেন আমি জানি।

রাতে না-ফেরা সে মেয়েটি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অথবা সম্পন্ন ঘরের মেয়ে হলে—হয়তো কিছুদিন কানাকানি করেছে লোকে—হয়তো মা-বাবা সে অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছেন অন্য কোথাও—মেয়েকে নিয়ে।

কিংবা মা-বাবার অবস্থা—বসত-ভিটা ছেড়ে যাবার মত না হলে—তারা থেকে গেছেন বাড়িতেই। তাকে নিয়ে কানাকানি চলেছে বহুদিন। তারপর কানাকানিও হয়তো একদিন ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে। কেবল মা-বাবার মুখ থেকে মুছে গেছে হাসি। আর মেয়েটির বিয়ে দেয়ার সময় নানান ঝনঝাট বেঁধেছে।

কিন্তু এসব কোনো ক্ষেত্রেই মামলা হয়নি। একটু বেশী রাতে বা একটু নির্জন জায়গা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো যে মেয়েটি—লোকচক্ষুর আড়ালে সে ধর্ষিতা হলে বাড়ির লোক চেপে যেতেই চায় সে ঘটনা। লুকিয়ে রাখতেই চায়। কারণ এ সমাজকে তারা তো চেনে।

আর তাই শহরতলির বনেদী গুণ্ডা বাহিনী বা উঠতি মাস্তান বাহিনীর বিকৃত জীবন ও বিকৃত কামনার শিকার এইসব মেয়েদের বিধ্বস্ত জীবন নিয়ে গল্প, নাটক, উপন্যাস বা সিনেমা ততো রচিত হয় না—যতো রচনা হয় এইসব বনেদী গুণ্ডা বা উঠতি মাস্তানদের জীবন নিয়ে।

হ্যাঁ—মিতা ধর্ষিত হয়েছিলো। কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে। বাড়ি

ফেরার সময় অনেকখানি হাঁটতে হতো মিতাকে। রাস্তাটি জায়গায়-জায়গায় নির্জন। এমনই নির্জন একটি জায়গায় এক কালভার্টের ওপর বসে থাকতো কিছু ছেলে। তারা কে, মিতা জানতো না। তবে গুন্ডা-মাস্তান-লোফার জাতীয় ছেলে—অনুমান করতো। তারা মিতাকে দেখলেই নানান মন্তব্য করতো, আওয়াজ দিতো। মিতা দ্রুত পায়ে, নতমুখে পেরিয়ে যেতো রাস্তাটা। কিন্তু সেদিন রাতে মিতাকে ওরা কালভার্ট পার হতে দিল না। টেনে নামিয়ে নিয়ে গেলো রাস্তার পাশে। নিচু এবড়ো খেবড়ো ইঁট পাথরে ভরা জমিতে। সেখানে দলবেঁধে তারা অত্যাচার চালালো মিতার ওপর।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো মিতা। ভোরে তার রক্তাক্ত, বিস্রস্ত, হতজ্ঞান শরীরটাকে মৃতদেহ ভেবে কোন একজন পথচারী মানুষ থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে মিতাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। আর জেলখানায় মিতার সঙ্গে দেখা হয় বলেই জানতে পারি—এ সময়ে কি হয় মিতার মত নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েদের অবস্থা। অত্যাচারিত হবার কথা প্রকাশ্য হয়ে যায় যেখানে—সেক্ষেত্রে 'পুলিশ কেস' হয়—সেখানে কি ঘটে মেয়েটির ভাগ্যে তা জানায় মিতা। যার সঙ্গে দেখা হ'লো জেলখানায়।

কিন্তু কি করে ভাবা যায় মিতার মত একটি মেয়ে থাকতে পারে জেলখানায়? নিজে অত্যাচারিতা হয়ে ঘৃণ্য অপরাধীর মত ব্যবহার সহ্য করে দিনের পর দিন!

* * *

এ সেই মিতা যে শোভার জন্য লক-আপ বয়কটের দিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। ছোটো মেট্রনের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য ক'রে—অনেক বিপদ মাথায় নিয়ে।

সেই মিতা, যার নীরব সাহস আর অনমনীয় দৃঢ়তা প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে ছিলো আমাকে।

সেই মিতা, যার কথা প্রথম বলেছিলেন দিদি, পুরোনো সেই ওয়েল ফেয়ার অফিসার।*

কোনো এক দুপুরে দিদি এসেছিলেন। আমাদের সেলের পাশের অফিসঘর থেকে উঠে। হাতে এক চিঠি। এবং যথারীতি উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর।—'ও কল্পনা, শোনো, শোনো একবার চিঠিটা, পড়ে শোনাচ্ছি…শুনে ভাবতেই পারবে না একটা ক্লাস এইট-পাশ মেয়ে এমন চিঠি লিখতে পারে।'

দিদি পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমরা শুনেছিলাম। সত্যিই ভাবা যাচ্ছিলো না। সুন্দর, সুলিখিত একটি চিঠি, ঝরঝরে পরিষ্কার নির্ভুল ইংরেজিতে লেখা। জেলের বিভিন্ন অব্যবস্থা ও অবিচারের প্রতিকার চেয়ে ওয়েলফেয়ার-দিদিকে লেখা একটি চিঠি। জায়গায়-জায়গায় বোধহয় মেট্রন সম্পর্কে কিছু লেখা ছিলো। কারণ দিদি কতকগুলো জায়গা বাদ দিয়ে পড়লেন—বোঝা গেলো। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে হলো না।

এমন মার্জিত ও স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগপত্রও যে লেখা যায়, দেখে মুগ্ধ হলাম।

---

* দ্রষ্টব্য: মীনাক্ষী সেন রচিত 'জেলের ভেতর জেল: পাগলবাড়ি পর্ব' নামক গ্রন্থ।

জলের অসুবিধে, অত্যধিক লোকসংখ্যার চাপ, জায়গার স্বল্পতা ইত্যাদি প্রতিটি সমস্যাই যথাযথভাবে ধরেছিলো সে এবং অতি সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখেছিলো। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ইংরেজি বিষয়ের স্নাতক শ্রেণীর একজন অধ্যাপকও তার কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে এমন চিঠি লিখতে দেখলে গর্বিত হতেন, যা লিখেছে ক্লাস এইট পাশ জেল বন্দিনী এক মেয়ে।

—দিদি কি কেস ওর ?

—রেপ কেস।

—ও জেলে কেন দিদি ?

—আর বলো কেন ? Unfortunate girl. can you imagine রাজশ্রী, ওকে বাড়ি থেকে নেয় না।

—কিন্তু জেলে কেন ?

—Safe Custody হিসেবে জেলে রয়েছে। বাড়ি থেকে নেবে না—তো যাবে কোথায় ? কেস চলছে তাই জেলে, পরে হয়তো 'হোমে' পাঠাবে—সে তো…তাতে কি আর কিছু সুবিধে…

—আচ্ছা দিদি, নাবালিকা মেয়ে মা-বাবার অমতে বাড়ি থেকে চলে গেলে—আইনের সাহায্যে মা-বাবা তো মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে পারে নিজের কাছে ?

—পারে।

—তবে নাবালিকা কন্যাকে ত্যাগ করার অধিকার কি করে আইনসম্মত হয় ? নাবালিকাকে দেখাশুনো করা মা-বাবার পক্ষে তাহলে বাধ্যতামূলক নয়। কেন ?

—আ-হু-হা মীনাক্ষী, অত তলিয়ে কে ভাবছে তোমাদের মতো। তাছাড়া অনেক ফ্যালাসী আছে…আইন যেমন আছে…তার অন্ধি সন্ধিও তো আছে অনেক…

—কি রকম দিদি ?

—যেমন ধরো—মিতার তো বাবা নেই, দিদির রোজগারে সংসার চলে, মার কোনো রোজগার নেই। তা কারো দিদিকে তার বোনের ভরনপোষণে জন্য আইনত বাধ্য করা যায় না। মা বলবে, আমার কোনো ক্ষমতা নেই ওর ভরনপোষণ চালানোর, দেখাশুনো করার। ব্যাস তবেই ও অনাথ হয়ে গেলো।

—কিন্তু এতদিন চলছিলো কি করে ?

—সে তো মিতা চাকরি করতো।

—তা যে চাকরি করে নিজের পেট চালায়, তাকে ছেড়ে দিলেই বা সরকারের ক্ষতি কি ?

—না, তা হয় না, সে নাবালিকা। বিনা অভিভাবকে তাকে ছাড়তে পারে না কর্তৃপক্ষ।

এইভাবে আমরা আইনের নতুন-নতুন দিক জানতে ও শিখতে থাকি। বাবা বেঁচে থাকতে-থাকতেই তাদের সবার আধপেটা খাওয়া আইনসম্মত ছিলো। আইন-

সম্মত ছিলো বাবার মৃত্যুর পর এক নাবালিকার জ্যাম-জেলী-আচারের কারখানায় চাকরি করা। নিজের ও গোটা পরিবারের পেটের ভাত জোগাড় করতে এক নাবালিকার বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করাও আইনসম্মত ছিলো।

কিন্তু অত্যাচারিত হবার পর হঠাৎ তার স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার লুপ্ত হয়েছে। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, সে নাবালিকা! আর তাকে ত্যাগ করেছে বাড়ির লোক। তাই নিরপরাধ মেয়েটিকে জেল খাটতে হবে!!

—কিন্তু কেন দিদি? বাড়ির লোকেরা কেন ওকে নিতে চায় না?

তার উত্তরে দিদি জানিয়েছিলেন এক অদ্ভুত কথা। মেয়েটির মা, অর্থাৎ আইনসম্মত অভিভাবকের ভীষণ অমত। তার মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে বাড়ি নিলে তিনি পতিত হবেন, তার চোদ্দগুষ্টি পতিত হবে—তার বাকি মেয়েদের বিয়ে হবে না। তাই মিতাকে তিনি ঘরে নেবেন না।

অথচ বাড়ি নিয়ে যেতে রাজী আছে তার চারবছরের বড় দিদি। মিতা বলেছিলো —মা নয়, দিদিই তাদের 'গার্জিয়ান'। তাই মিতার দিদিকে চিঠি লিখেছিলেন ওয়েল ফেয়ার অফিসার। বোনকে বাড়ি নিয়ে যাবার অনুরোধ জানিয়ে। মিতার দিদি উত্তর দিয়েছে। সেখানেই লিখেছে, সে মিতাকে নিতে চায়, কিন্তু মা কোনমতেই রাজী নয়। তাই সে নিরুপায়?

—তবে?

—আমি আশা ছাড়িনি।' দিদি বলেছিলেন। 'চিঠি লিখে যাচ্ছি ওর দিদিকে। দিদি যখন স্বাবলম্বী ও সাবালিকা, সে গার্জিয়ান হিসেবে দাঁড়ালেই চলবে। দিদি নিয়ে যাক মিতাকে বাড়িতে। তারপর মা আর কি করবে?' এসব নানান কথা বুঝিয়ে, দিদির মানবিকতার কাছে আবেদন জানিয়ে, চিঠির পর চিঠি দিয়ে চলেছেন ওয়েল ফেয়ার অফিসার। যদি তাতে পাষাণ গলে।

—কিছু লাভ হয়েছে?

—একেবারে হয়নি বলা যায় না। এই দেড় বছর তো পরিবারের সঙ্গে মিতার কোনো যোগাযোগ ছিলো না। এখন দিদির সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্র চালাচালি হয়··· দেখা যাক্।

এইভাবেই এই দিদি মিতার সঙ্গে তার দিদির যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। এবং নিজেও মাঝে-মধ্যেই চিঠি দিতেন। দিদিকে বুঝিয়ে লিখতেন। সে যেন নিয়ে যায় বোনকে।

আর একদিন দিদি মিতার অন্য একটি চিঠি দেখিয়েছিলেন। সেটি বাংলায় লেখা। চাপা রাগ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর কৌতুক মেশানো একটি রীতিমত রম্য রচনা।

বন্দিনীদের অনেক ভাগ্য, তাদের জন্য হাসপাতাল আছে। তবে সে হাসপাতালে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই, এই যা। সরকারবাহাদুর সদাশয়, তিনবেলা নিয়মিত আমাদের জন্য খাবার আসে। তবে তা অখাদ্য। আমাদের জন্য ডাক্তারও

আছেন। তবে পেন-কিলার ছাড়া অন্য কোনো ওষুধের নাম তিনি ভুলে গেছেন, এই দুঃখ।...

এইভাবে প্রায় দু-পাতার একটি চিঠি। একটি ক্লাস এইট পাশ মেয়ের চিঠি।

ওয়েল-ফেয়ার দিদির অবিরাম চেষ্টার ফলে মিতার দিদি একদিন বোনের সঙ্গে দেখা করতেও আসে। শুনি, মিতার দিদি নাকি কথা দিয়েছে। মাকে কোনমতে রাজী করিয়ে ছাড়িয়ে নেবে মিতাকে। উল্লসিত ওয়েল ফেয়ার দিদিই একথা আমাদের জানান।

তারপর ওয়েল ফেয়ার দিদিকে 'ওরা' ওয়ার্ড থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়ায়। সে মামলা খারিজ হয়ে গেলে দিদিকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়। এবং জেলখানায় বন্দীকল্যাণ করতে চাওয়ার অপরাধে আরও কত লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে-করতে দৃঢ়চেতা এই মহিলা শেষ পর্যন্ত চাকরি কখন ছেড়ে দেন, তা আর কখনো জানা হয় না আমাদের।

কিন্তু এটুকু দেখতে পাই, এই জেলখানায় মিতাদের জন্য ভাববার, তাদের জন্য কিছু করার লোক আর কেউ থাকে না। তাই মিতার খবরও আর কারও কাছ থেকে শোনা হয় না। এবং সময়ের আবর্তনে, হাজারো ঘটনার প্রবাহিত স্রোত, মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে দেয় ধর্ষিতা-নিরপরাধিণী একটি মেয়ের ভাগ্যে কি ঘটলো তা জানার কৌতূহল।

তারপর সেদিন মিতার সঙ্গে দেখা হয়। জেলের উঠোনে। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটুখানি সাহায্যের আশায় শোভা এসেছিলো আমাদের কাছে। আর মিতা আসে বিপদের সময় আমাদের পাশে দাঁড়াতে। বিনা আহ্বানে। জনা কুড়ি সঙ্গিনী নিয়ে।

মুগ্ধ হয়ে যাই। যদিও তখনও মনে পড়েনি এ মিতাই সেই মেয়ে। যার চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন ওয়েলফেয়ার দিদি। শোভার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলা-কালীন তাকে ডেকে পাঠাই। ডেকে পাঠানো মাত্র সে আসে। তার সঙ্গে কথা বলে অবাক হই—এবং তখন আবছা স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে বুঝি, এ-ই সে। সেই মিতা। যার দুটি চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন দিদি।

কিন্তু ও কেন এতদিন আসেনি এই মেয়াদি নম্বরের জানলায়? এই দু বছরে একবারও আমাদের কাছে আসেনি মিতার মত মেয়ে! অবাক লাগে।

অথচ ডেকে পাঠানোর পর থেকে সে রোজ আসে। ব্যতিক্রমহীনভাবে। এবং ধীরে-ধীরে একদিন সম্পূর্ণ করে তার পনের-ষোল বছরের লাঞ্ছিত জীবন-বৃত্তান্ত। তখন বুঝি, কেন সে ডেকে পাঠানোর আগে আসে নি আমাদের কাছে। প্রখর আত্মসম্মান বোধ আছে মেয়েটির। কিন্তু অত্যাচারিত হবার পর থেকে ঘৃণ্য অপরাধীর সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার করা হয়ে থাকে—সেই ব্যবহারই সে পেয়েছে। এমন কি তার মা-ও তাকে 'নষ্ট মেয়ে' বলে ত্যাগ করেছে। তাই তার এই ক্ষুব্ধ

আশংকা ঃ যেচে কথা বলতে এলে আমরা যদি ওকে অবজ্ঞা করি। ঘৃণা প্রকাশ করি। তাই যেচে আসেনি। কিন্তু ডাকতেই সে আসে। এবং চিরদিনের জন্য জায়গা করে নেয় আমাদের মনে।

আর ধীরে-ধীরে ভয় না-পাওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব বর্ণময় এক চরিত্র হয়ে ওঠে সে জেলখানায়।

* * *

আসলে মিতা একা নয়। একসঙ্গে তিনটি নাম দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এই মহিলা ওয়ার্ডে। রীণা—মিতা—পুতুল।

রীণা আর পুতুল চুরি কেসের বন্দিনী। পুতুল মনিব-বাড়ি থেকে চুরি করেছিলো দুটি পুরোনো কাপড়। সেই অপরাধে দুবছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে সে।

পুতুল অবশ্য স্বীকার করেছে, চুরি সে করেছে। তবে রাগের মাথায়। তাকে বাড়ি যাবার অনুমতি দেয়নি মনিব। সে জোর ক'রে চলে যেতে চাইলে তার তিন-মাসের মাইনে আটকে দিয়েছে।

সেই রাগে আলনা থেকে দুটি পুরোনো শাড়ি চুরি করে পালিয়েছিলো বাড়িতে। এই গুরুতর চুরির অপরাধে তার বিচার চলছে বছরের পর বছর ধরে।

আর রীণা। সে তো বলে, আদপেই কোনো চুরি সে করেনি। কামার্ত মনিবের যৌন ইচ্ছাকে প্রতিহত করেছিলো বলে পরদিন মিথ্যা চুরির দায়ে তাকে পুলিশে দেয় মনিব।

শহুরে সুন্দরী রীণা, কালো উজ্বল ডাগর চোখ। গ্রাম্য পুতুল। আর মিতা। এই তিনজন হরিহর-আত্মা হয়ে ওঠে জেলখানার ভিতর।

আর এই তিনজনে মিলে ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত করে তোলে মেট্রন ও কর্তৃপক্ষকে।

সবচেয়ে বড় গোলমালটি বাধে রীণার ওষুধ নিয়ে।

হাজতি নম্বরে রীণার জায়গা হয়েছিলো পেচ্ছাপখানার পাশ ঘেঁষে। হালকা, মসৃণ, স্পর্শকাতর ত্বক রীণার। সম্ভবতঃ নোংরার সংস্পর্শে এসে অ্যালার্জী হয় তার। কিংবা অন্য কোনো অজানা রোগও হয়ে থাকতে পারে—জানি না। মোট কথা, বুকটা প্রায় চার ডবল এবং লাল হয়ে ফুলে উঠেছিলো রীণার—চোখটোখ সব ঢেকে গেছিলো। সঙ্গে গলাটাও একইভাবে ফুলে ছিলো—ফলে ঢোক গিলতে বা খাবার খেতেও পারছিলো না রীণা।

সুন্দর ছোট্ট পানপাতামুখ মেয়েটা এমন বীভৎস দেখতে হয়েছিলো যে মীরারা পর্যন্ত বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেয়। ডাক্তার দেখাতেও দেয়।

ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওষুধও দেন। তাতে মুখের ফোলা কতকটা কমে আসামাত্র গলাধাক্কা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। যদিও

তখনও মুখের ফোলা ভালো করে কমেনি—গলার কষ্ট আর অল্প শ্বাসকষ্টও রয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ হাত-পা ফোলা।

ডাক্তারের কাছে আর্জি জানিয়েছিলো রীণা। সে হাসপাতালে থাকতে চায় আরও কদিন। কিন্তু ডাক্তার তার আর্জিতে কান দেননি। কেবল বলেছেন, হাসপাতালে থেকে লাভ কি? ওষুধ লিখে দিয়েছেন তিনি। দামী ওষুধ। সেসব ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে রীণা।

কিন্তু রীণা কোনো ওষুধ-ই পেলো না। হাসপাতাল থেকে বাইরে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো তার চিকিৎসা।

ওষুধ চাইতে গেলে মেট্রন ধমকালো। মাসীরা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো। ডাক্তার তার বড়-বড় হলুদ দাঁত বের করে একটু অপ্রতিভ থেকে চুপ রইলেন।

আসলে কোনো অদৃশ্য কারণে ডাক্তাররা মেট্রনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কিছু করেন না। অবশ্য চিফ মেডিকেল অফিসার এর ব্যাতিক্রম। তার দাপটের কাছে মেট্রন জড়োসড়ো হয়ে থাকে।

সে যাই হোক, হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত হবার আগের দিন রীণা নিজের চোখে দেখেছে। বড় বড় কয়েকটি রূপোলী পাতায় এবং বাদামী রঙের একটি বোতলে তার নামে ওষুধ এসেছে। বুঝে নিয়ে আলমারিতে তুলে রেখেছে মেট্রন। তবে কেন সে ওষুধ পাবে না? আর ওষুধ না পেলে তার চলবেই বা কি করে? বড় যে কষ্ট তার। বাঁচবে তো সে?

এই অবস্থায় এগিয়ে আসে মিতা। ধীর স্থির, আত্মস্থ, সাহসী মিতা। রীণাকে খুব ভালবাসে সে। আর নেতৃত্বের স্বাভাবিক দক্ষতা দিয়ে মিতা সঙ্গে টেনে নিলো পুতুলকে। পুতুল ভীতু। কিন্তু সে রীণাকে ভালোবাসে। মিতাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে।

এই তিন বন্ধু মিলে জোট বাঁধে। সঙ্গে নেয় আরও জনা পনেরো মেয়েকে।

—রীণাকে ওষুধ দাও, রীণার ওষুধ রীণাকে দাও…

এই দাবীতেই হৈ-চৈ পড়ে যায় মহিলা ওয়ার্ডে। শোভার ঘটনার পর এটি-ই প্রথম ঘটনা, যখন প্রায় সমস্ত ওয়ার্ড সরব বা নীরব প্রতিবাদে মিতাদের সমর্থন জানায়।

কিংবা এটি প্রথম। যখন আমরা একেবারে চুপ করে আছি, কিন্তু রীণা, মিতা এবং হাজতি নম্বরের অন্যরা লড়ছে অসুস্থ রীণার ওষুধ আদায়ের দাবীতে।

প্রতিবাদের ফল যেমন হয়ে থাকে—তেমনই হলো। প্রথমে মারধোর। সকলকেই। কম বা বেশী। হাসপাতালের সামনে অবস্থান ও দাবী পেশ করার আন্দোলন এর আগে কখনো হয়নি। তাই মেট্রনের রাগ কিছু বেশীই ছিলো। মিতা আর রীণা-ই মার খেলো সবচেয়ে বেশী। আশ্চর্য মেয়ে দুজন। একবারও মুখ দিয়ে একটি শব্দ

না-করে মার খেলো দ্জনে। ডিভিশনবাড়িতে বসে মারের খবর পেলাম। পেলাম না কোনো কান্না বা আর্তনাদের শব্দ, আওয়াজ। .

রীণা আর মিতার সঙ্গে মার খেয়েছিলো পুতুল এবং অন্যরাও। তারা অবশ্য ভীষণ কাঁদছিলো।

বন্দিনীদের মধ্যেই তো মেট্রনের লোক থাকে। তাই মেট্রন নির্ভুলভাবে জানে, কারা দলের মাথা। হাসপাতালের সামনে থেকে সবাইকে সরিয়ে দেবার পর মেট্রন ডিগ্রীতে পাঠায় রীণা, মিতা, পুতুলকে।

সেই ডিগ্রী। আমাদের সেই বুক ঢিপ ঢিপ। পারবে তো ওরা ?

এটা শীতকাল নয়—বেশ গরম এখন। এটা ভালো। ডিগ্রীতে শীতের কষ্টটা অন্তত পাবে না।

কিন্তু ভয় ? না, মিতা ভয় পাবে না। সে আমরা জানি। ভুত-প্রেত-দত্যি-দানো কেউ-ই মিতার মত মেয়েকে ভয় দেখাতে পারবে না।

রীণাটাও যথেষ্ট সাহসী ও শক্ত মেয়ে। তার ওপর, ওর জন্যই এই প্রতিবাদ। সুতরাং রীণা ঘাবড়াবে না বলেই আশা করি।

ভয় কেবল পুতুলটাকে নিয়ে। ওটা একেবারে ভীতুর ডিম।

একজন ভয় পেয়ে গেলে—সে ভয় অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হতেই পারে। ভয় বড় সংক্রামক ব্যাধি। একথা এতদিনে তো আমাদের আর জানতে বাকি নেই।

যা ভেবেছিলাম—ঘটলও ঠিক তাই। রাত বারোটা নাগাদ পুতুলটা গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলো রীণা আর মিতাকে। কথা বলতে লাগলো অনর্গল। বুঝলাম ভয় করছে ওর। আর সেই ভয় কাটানোর চেষ্টায় শেষে কাঁদতে শুরু করে দিলো পুতুল। রীণা বলে চেঁচিয়ে—ভয় পাসনা, ভয় নেই। পুতুলকে রীণা বলতে লাগলো এত চেঁচিয়ে যে আমরাও সে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

রীণার ভাঙ্গা-গলা ভয় ধরিয়ে দিলো মনে। তবে কি রীণারও ভয় করছে ? তারপর ? মিতা ?

মিতার ভয় পাওয়া মানে অনেক কিছু। মস্ত বড় ক্ষতি। নিরপরাধ, শান্ত, দৃঢ়-চেতা এই মেয়ে সমস্ত মহিলা ওয়ার্ডে অন্য এক ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা অনেকের বুকে ভরসা জাগায়। সে যদি ভয় পেয়ে যায় ? তবে ?

এতক্ষণ চুপ করে ছিলো মিতা। প্রায় কোনো কথা বলেনি। এবার বলে—'পুতুল আয় গান গাই।'

রীণা উৎসাহের সঙ্গে বলে—'হ্যাঁ, চল গান গাই।'

পুতুল চুপ করে রইলো।

তারপর গান গাইতে শুরু করলো ওরা। প্রথমে মিতা তারপর রীণা। সবশেষে গলা মেলালো পুতুল।

মোরা দুঃখকে করি না ভয়
মোরা মৃত্যুকে করেছি জয়
মোরা পরাজয় মানিনি কলঙ্ক আনিনি
রয়েছি অনড় অটল

এ গান আমাদের ওয়ার্ড থেকে গাওয়া হয়। এ গান গাই আমরা—সকালে কিংবা সন্ধ্যা রাতে। কিন্তু নিস্তব্ধ, নিঝুম জেলের রাত এ গান কখনো শোনেনি। রীণা-মিতা-পুতুলের মত কোনো বন্দিনীর কণ্ঠে মহিলা ওয়ার্ড কখনো এ গান শোনেনি।

আমরা মোহগ্রস্তের মত শুনতে থাকি সেই গান। শোভার চিৎকার বা শ্লোগানের চেয়েও অবাস্তব শোনায় এ গান মহিলা ওয়ার্ডে—মধ্যরাতের পটভূমিকায়।

এখন কি ওয়ার্ডাররা চুপ করে থাকবে! একবারও কি নিষেধের চিৎকার ওঠাবে না এ গানকে বন্ধ করার চেষ্টায়!

ওরা বারবার গাইলো। গলা খুলে গাইলো। মন ভরে গাইলো। ওই একটিই গান—তার কয়েকটি লাইন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

…মোরা পরাজয় মানিনি কলঙ্ক আনিনি
রয়েছি অনড় অটল…

মনে পড়ছিলো। আমার মনে পড়ছিলো। জেল থেকে দ্বিতীয়বার লালবাজার নিয়ে যাওয়ার সময় কল্পনা এ গান শিখিয়ে দিয়েছিলো আমাকে।

এই গান লালবাজারে বসে অনেকবার গেয়েছি আমি। গাইতে চেষ্টা করেছি বহু ভয়ানক সময়ে। কিন্তু তা মনে মনে—মনের ভেতরে…

অত্যাচার-ঘরের অশুভ নৈঃশব্দকে ভেঙেচুরে তো গেয়ে উঠতে পারিনি এই গান এমন উচ্চস্বরে…আজ মিতা যেমন করে গাইছে।

সেই মিতা। সাহসী মিতা। নিঃস্বার্থ মিতা। নিজের বিপদে আমাদের সাহায্য যে চায়নি, চেয়েছে আমাদের বিপদে সাহায্য করতে।

রীণার ওষুধ আদায়ের জন্য জনবল সংগ্রহ করে সে লড়তে নামে এবং এই প্রথম ডিগ্রীকে ঘিরে থাকা অলৌকিক ভয়ের আবরণকে অক্লেশে ভেঙ্গে ফেলে মিতা। ভীতু পুতুলের ভয়ও সে ভেঙ্গে দেয়। তার হাত ধরে সাহসী করে তোলে তাকে।

তিনজনে মিলে দিব্যি রাতের পর রাত ডিগ্রীতে কাটিয়ে দেয়। হেসে আর গান গেয়ে।

তবে রীণার ওষুধ তারা আদায় করতে পারে না। বোধ হয় ওষুধটি খুবই দামী। তাই রীণাকে তা কোনো কারণেই দিতে রাজী হয় না মেট্রন।

ডিগ্রী থেকে অবশ্য ওদের ছেড়ে দিতে হয়। ডিগ্রী হ'লো টিবি রোগী, বদ্ধ পাগল আর অবাধ্যদের শায়েস্তা করার জায়গা। সেই ডিগ্রীকে যদি কেউ ভয় না পায় —তাদের ডিগ্রীতে আটকে রাখা মোটেই নিরাপদ নয় মেট্রনের পক্ষে।

তাই মেট্রন ডিগ্রী থেকে তাদের ছেড়ে দেয়। অন্যরা মারধোর খেয়ে, শাসানি ধমকানি শুনে পিছিয়ে গেছিলো অনেকটাই।

তিনমূর্তি তাতেও দমে যায় না। প্রায়ই হাসপাতালের সামনে ধর্ণা দেয়। রীণা ওষুধের জন্য দাবী জানায়। আর দিন-দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে সে।

মনিবের একটি ঘড়ি ও কিছু টাকা পয়সা চুরির দায়ে অভিযুক্ত রীণা। যে নিজেকে নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে। একটি ঘড়ি ও কিছু টাকা চুরির দায়ে জেল খাটতে থাকা সেই রীণার ওষুধ হাসপাতালে এসেও উধাও হয়ে যায়। আর কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে জেলখানার মহিলা ওয়ার্ডের শৃংখলা রক্ষা করে মেট্রন।

এবং চুরি কেসে বিচার চলে রীণার—পুতুলের।

দুটি পুরোনো কাপড় চুরির দায়ে দেড় বছর ধরে বিচার চলে জেলবন্দী পুতুলের। আরও কতদিন চলবে কে জানে।

তারপর সমাধান আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। জেল-কর্তৃপক্ষ ও ডাক-বিভাগ উভয়ের সৌজন্য মিলিত হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের দূরতম এক প্রান্তে রীণার বড়দিদির কাছে গিয়ে পেঁছোয় রীণার চিঠি। যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত জামাইবাবু দিদিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসেন নির্দ্বিধায়। রীণার জামিন করিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চান সঙ্গে সঙ্গেই।

তারপর একদিন রীণা এসে মিতা আর পুতুলের সঙ্গে দেখাও করে যায়। রীণা আর তার ছোটো বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে দিদি-জামাইবাবু। মনিবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কেসও মিটিয়ে নিয়েছে তারা।

রীণা চলে যায়।

জমি-জিরেত বিক্রি করে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে আদরিনী মেয়ের জামিন করিয়ে নেন পুতুলের গরীব বাবা।

রয়ে যায় মিতা। রীণা বা পুতুলের নামে তবু দুটি অভিযোগ ছিলো। তাই তাদের জামিন পাওয়ার সুযোগ ছিলো। মিতা নিরপরাধ। মিতা অত্যাচারিতা। তাই বন্দীদশার অত্যাচার ভোগ-করা ছাড়া অন্য কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিলো না।

যদি শয়তানেরা মিতার জ্ঞানটুকুও রাখতো।, যদি টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে বাড়ি পেঁছোতেও পারতো মিতা—হয়তো সব চেপে যেত বাড়ির লোক। তাতে ধর্ষকরা শাস্তি পেত না। তা তো এখনও পাচ্ছে না। আদৌ পাবে কিনা কে জানে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দুবছর জেলখাটা হয়ে গেছে মিতার।

—কিন্তু মিতা, তোর দিদি এত ভালোবাসে তোকে, এত বিবেচক, সে কেমন করে তোকে ত্যাগ করলো ?

—দিদির দোষ নেই।' মিতা বলতো। বলতো পুলিশের হাতে যাওয়ার পর তার অভিজ্ঞতার কথা।

জ্ঞান ফিরে আসার পর, একটু সুস্থ হয়ে-ওঠার পর তাকেই জেরা—জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিলো পুলিশ।

না, পুলিশ কর্তব্যে অবহেলা করেছে—এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। মিতার জবানবন্দি অনুসারে কালভার্টের ওপরে বসতো যে সব ছেলেরা, তাদের প্রায় সবাইকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলো পুলিশ।

কিন্তু তারপর আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে, এ মাস্তানেরা সকলে বেকারত্ব ও গরিবীর জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে তৈরী হওয়া মাস্তান নয়—অনেক গল্প, নাটক, সিনেমা বা উপন্যাস যেমন বলে থাকে। এদের অনেকেই পয়সাওয়ালা বাপের বখে-যাওয়া ছেলে। বেকার বটেই। কারণ লেখাপড়া বা অন্য কোনো কাজই তাদের তেমন শেখা হয়ে ওঠেনি—মাস্তানি আর বদমায়েশি বাদে।

অবশ্য সবাই এক রকম নয়। এক অবস্থার নয়। মিশ্র একটি দল। কেউ নিম্নবিত্ত ঘরের, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ সম্পন্ন, কেউ একটু-আধটু লেখাপড়া জানে, কেউ কিছু জানে না। কিন্তু দলের 'গুরু' হল সব সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা। তাদের মা-বাবাদের থানায় আগমনে থানা অফিসারদের চেহারা কিছু বদলে গেলো। শুরু হলো মিতাকে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ।

এমনটি কিন্তু আর কোনো কেসের বেলা হয় না। কিংবা হয়ও—যে গরীব, সহায়সম্বলহীন—সে বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে তাকে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ সব সময়ই করা হয়ে থাকে। যেমন করা হয় এইসব অত্যাচারিতা মেয়েদের।

অথচ পয়সাওয়ালা লোক কোনো রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ বা প্রাথমিক ভিত্তি ছাড়া, যে কোনো সময়ে যে কারো বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করতে পারে। কোর্টের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেনার পয়সা পকেটে থাকলে আইন-সম্মতভাবে হাজার হাজার দেওয়ানী মামলা রুজু করা যায়।

যারা ভুক্তভোগী তারা সকলেই জানেন—একজন পয়সাওয়ালা লোক এই দেওয়ানী মামলার পাকে-পাকে জড়িয়ে সর্বনাশ করে দিতে পারে একটি সম্পূর্ণ নিরীহ লোকের।

মামলার নিষ্পত্তি যদি ন্যায়ের পক্ষেও হয়—তবুও মামলার ঝামেলা ও খরচ টানতে টানতে বিধ্বস্ত সর্বস্বান্ত গরীব বা মধ্যবিত্ত লোকেদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইচ্ছামত দেওয়ানী মামলা ঠুকে দেয়া, পয়সাওয়ালা মামলাবাজ লোকেদের হাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক পাশুপত অস্ত্র হিসাবে প্রযুক্ত হয় বর্তমান এই আইনী ব্যবস্থায়।

ফৌজদারী মামলার বেলায় অবশ্য পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে হয়। এজাহার দিতে হয়। অভিযোগকারী গরীব, চালচুলোহীন না-হলে, ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী লোক না হলে এবং কেসটি না-নেয়ার জন্য প্রভাবশালী কেউ প্রভাব বিস্তার না-করে থাকলে, পুলিশ সব অভিযোগই নির্বিচারে গ্রহণ করে। তদন্ত করে, প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে, মামলা দায়ের করে।

যেসব অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করে—সেগুলোর বেলায় অভিযোগকারীকে পুলিশ জেরায় জেরবার করে—এমন হওয়ার কথা নয়। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পুলিশ জেনে নেবে অভিযোগকারীর কাছে থেকে, এটাই নিয়ম।

কিন্তু গরীব চালচুলোহীন মানুষ কিংবা ধর্ষিতাদের বেলায় এ প্রথা পালটে যায়। যেমন গিয়েছিলো মিতার বেলা।

পুলিশ-হেফাজতে রেখে, রীতিমত জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিলো পুলিশ, ধমক চমক্ দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে—

—অত রাতে কালভার্টের ওখানে কি করছিলি?

—ওই ছেলেদের সঙ্গে আগে থেকে চেনা ছিলো নিশ্চয়ই, কত মেয়ে তো রাস্তা দিয়ে যায়—তোকেই কেন ধরলো বেছে বেছে?

—দেখতে তো তেমন পরীটরি কিছু না, তবে?

—নিশ্চয়ই ফষ্টিনষ্টি করতি ওদের সঙ্গে, শেষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে…

—অত রাতে কোনো ভদ্দর লোকের মেয়ে বাড়ির বাইরে থাকে?

—অত ভালো-ভালো ঘরের সব ছেলে তোর দিকে ইচ্ছা হবে কেন? তোর কোনো উস্কানি না থাকলে…

সত্যিই তো—জ্যাম জেলীর কারখানাটি রাত নটা পর্যন্ত খোলা থাকতে পারে—ওভারটাইম চলতে পারে সেখানে রাত নটা পর্যন্ত—কিন্তু পেটের জ্বালায় যে সব মেয়ে রাত নটা পর্যন্ত ওভার টাইম খেটে বাড়ি ফিরছে—তারা খুবই অন্যায় করে ফেলেছে—রাত নটার পর নিরাপদে বাড়ি ফেরার অধিকার কি আর কোনো সভ্য দেশের ভদ্র মেয়েদের থাকতে পারে?

কিংবা ওরা কি আর ভদ্র মেয়ে? গরীব আর ছোটোলোক কথাটি তো আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছেই সমার্থক।

আর কোনো মেয়ে—যদি কোনো ছেলেদের সাথে 'ফষ্টিনষ্টি' করেই থাকে—তবেই বুঝি সেই ছেলেদের অধিকার জন্মে যায় মেয়েটিকে অত্যাচার ক'রে অজ্ঞান ক'রে বিবস্ত্র ক'রে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখার?

মিতার মত সহায়সম্বলহীন এইসব মেয়েদের রাত ক'রে বাড়ি ফেরার অধিকার নেই, ছেলেদের সাথে 'ফষ্টিনষ্টি' করার অধিকার নেই, কিন্তু ওইসব বিত্তবানের পুত্রদের অধিকারের সীমা কতদূর বিস্তৃত, শুনতে শুনতে আমরা স্তম্ভিত হতে থাকি।

একটি মেয়ে, একাধিক পুরুষের অত্যাচারের চিহ্ন শরীরে নিয়ে—রক্তাক্ত, আহত, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। শরীরের মধ্যে মাঠের কাঁকড়, ঢিল, খোয়া, কাঁটা বিঁধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছিলো শরীর। চার ফুট ইঞ্চিপাঁচেক লম্বা, রোগা, না-খাওয়া ক্লান্ত এক মেয়ে—সে ঘটনার বহুদিন পরও মিতার দিকে চেয়ে—ওই ভয়ানক দৃশ্য কল্পনায় আনলেও ক্রোধ আর দম-আটকে-যাওয়া কষ্টে ভরে ওঠে মন।

আর তখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি যে মিতা—তাকে এসব কথাবার্তা বলেই নাকি জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো পুলিশ।

সত্তরের দশকের এইসব থানা পুলিশ যারা জানেন, তারা এ-ও জানেন—'মহিলা পুলিশ' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব কোনো থানাতে, এমনকি খোদ লর্ড-সিনহা রোড বা লালবাজারেও ছিলো না। কাজেই কতিপয় পুরুষ পুলিশই মিতাকে এই অতি স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে জেরা জিজ্ঞাসাবাদ ধমক চমক করেছিলো।

আর শুধু মিতাকেই নয়—মিতার দিদিকেও। মিতার মা কোনদিনই আসেননি মেয়েকে দেখতে। রাত করে মেয়ে বাড়ি ফিরলে তার আপত্তি হতো না দিদির মতো। কারণ তাতে বেশী পয়সা আসতো ঘরে। এ সময়ে কিন্তু প্রখর হয়ে উঠলো তার আত্মসম্মান বোধ।

থানায় গিয়ে তিনি মান-সম্মান নষ্ট করতে পারবেন না, জানিয়ে দিলেন।

তাই থানায় একলা আসতে হতো মিতার দিদিকে। এবং পুলিশের জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ প্রথমেই ঘাবড়ে দিলো তাকে।

বোনের চরিত্র কেমন, রাত করে বাড়ি ফিরতো কেন—এসব প্রশ্ন হাজারবার করা হলো তাকে। অন্যদিকে চলছিলো পাড়া-পড়শির গুঞ্জন, কানাকানি এবং কুৎসা। যাদের প্রত্যেকের ঘরে-ঘরে মিতার মত মেয়ে—যাদের প্রত্যেক বুকের ভেতর বড় হয়ে ওঠা মেয়ের জন্য চিন্তা—ক্রমশঃ বাড়তে থাকা মাস্তানি ও গুণ্ডামির ভয়ে যারা প্রতিদিন আরও বেশী-বেশী করে ভীত—তারাও যে কেন এমন করে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তাদের পাশের ঘরের একটি লাঞ্ছিত মেয়ের ওপর—তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা কঠিন।

কিন্তু তাদের কানাকানি চলতে থাকে। আর চলতে থাকে মিতার মায়ের বিলাপ।

ওই নষ্ট মেয়ে ঘরে আনলে তার অন্য মেয়েদের আর বিয়ে হবে না। ও মেয়ের জীবন তো নষ্টই হয়ে গেছে। এখন ওই নষ্ট মেয়ের জন্য গোটা পরিবার উচ্ছন্নে যাবে।

প্রতিবেশীর কানাকানি, মায়ের বিলাপ, এসব কোনো কিছুতেই টলেনি মিতার দিদি। সে কেবল ভয় পেয়েছিলো পুলিশের ব্যবহারে। কিন্তু মিতাকে বাড়িতে না-নেয়ার কথা সে ভাবেই নি। ভাবেনি তার একটা বড় কারণ এই যে, মিতাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে—এটাই সে জানতো। মিতাকে ত্যাগ করার বিকল্প রাস্তাও যে আইনসম্মত ভাবেই আছে—সেকথা দিদি জানতোও না।

কিন্তু যখন শুনলো মিতাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হলে কোর্টে যেতে হবে—কাউকে মিতার অভিভাবক হিসেবে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন একেবারে ঘাবড়ে গেলো দিদি।

আসলে 'অভিযুক্ত বনাম রাষ্ট্র' কেস চলছে। মিতা এক রাষ্ট্রের পক্ষের এক 'Exhibit' মাত্র। প্রধান 'Exhibit' নাবালিকা এবং পুলিশ হেফাজতে আছে। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হলে অভিভাবককে ন্যায্য অভিভাবকত্ব প্রমাণ করতে হবে। তারপর প্রয়োজন হলেই 'Exhibit'-কে উপস্থিত করতে পারবে—এমন শর্ত সাপেক্ষে

অভিভাবকের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে মিতাকে। 'Exhibit'-কে ঠিকমত রাখতে পারবে কিনা—সেটা ঠিকমত জানা চাই তো।

এদিকে মিতার দিদি। থানায় আসার পর থেকেই রকমসকম দেখে তার তো মনে হচ্ছে, তার বোনই কোনো অপরাধ করেছে, এখন সে-ও জড়িত কিনা জানতে চায় পুলিশ। আইন কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব ঘাবড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তার ওপর মা বিরূপ, পাড়া প্রতিবেশী নিন্দুক। শেষ পর্যন্ত কোর্ট, উকিল, মুচলেকা এসব নানান কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলো দিদি। সে-ও তো এক উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে।

থানায় এসে চোখের জলে দিদি মিতাকে জানিয়ে গেলো তার অসহায়তা। প্রখর আত্মঅভিমানী মিতা একটি অনুরোধও আর করেনি দিদিকে।

তারপর কোর্টে এসে কেউ আর দাবী করলো না মিতার অভিভাবকত্ব। তাই কেস চলাকালীন সময়ে 'নিরাপদ হেফাজত' জেলখানায় আসতে হলো মিতাকে। 'Exhibit'-কে নিরাপদে রাখার শ্রেষ্ঠ জায়গা।

*　　*　　*

মিতাকে বাড়ি নিয়ে যায়নি দিদি। তবুও ক্ষীণ হয়নি তাদের যোগাযোগ। আগে ব্যারাকপুর জেলে ছিলো মিতা। দিদি আসতো দেখা করতে। তারপর সে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো একটি ঘটনায়।

ব্যারাকপুর জেলেই টি. আই. (T. I.) প্যারেড হয়েছিলো। মিতা শনাক্ত করতে পারে কিনা সেই পরীক্ষা।

কিন্তু মিতা কাউকে শনাক্ত করতে পারলো না।

—কিন্তু কেন? তুই কাউকে চিনতে পারিস নি?

—না দিদি। কি করে পারবো? রাত্তির, অন্ধকার। ভয় করছিলো, মুখ নামিয়ে প্রায় দৌড়ে যাচ্ছিলাম। ওরা এসে ধরলো, টেনে মাঠে নামলো…এটুকুই তো মনে আছে। কাউকে দেখিনি তখন। চিনতেও পারিনি।

—কিন্তু কালভার্টের ওপরে যারা বসতো তাদের কাউকে তুই চিনতে পারিস নি? তারা কেউ ছিলোনা টি. আই. প্যারেডে?

—ছিলো তো।

—তবে?

—ম্যাজিস্ট্রেট তো আমায় জিজ্ঞাসা করেনি কারা কালভার্টে বসে, তোমায় বিরক্ত করতে। তাদের চিনিয়ে দাও। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলো, যারা দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে রেপ করেছে কিনা দেখিয়ে দাও।

—তো কালভার্টে যারা বসতো— কাণ্ডটা কি তারাই ঘটায় নি?

—তাদের কেউ কেউ ঘটিয়েছিলো দিদি। কিন্তু সবাই হয়তো নয়। যারা-যারা

এ কাণ্ড করেছে—তাদের চিনতে আমি তো পারিনি—আমি ভেবেছিলাম যা সত্যি—তা-ই আমার বলা উচিত।

—ওঃ, মিতা, এটা অসহ্য। কালভার্টে যারা বসতো তাদের মধ্যে যারা টি. আই. প্যারেডে ছিলো সবাইকে শনাক্ত করা উচিত ছিলো তোর !

—তাই বলছো দিদি ? তোমরাও ! দিদিও সে কথাই বলেছিলো। রাগ করেছিলো দিদি। সবাই মিলে নানা সন্দেহ-র কথা আগেই দিদির মাথায় ঢোকাচ্ছিলো, এখন দিদিরও মনে সন্দেহ হয়ে গেলো…

সত্যিই ছেলেগুলোর সঙ্গে আমার কোনো ব্যাপার ছিলো কিনা সন্দেহ ক'রে রাগে, ঘেন্নায় আর এলোনা দিদি।

এ কথা বলার সময়—মিতার শুকনো খরখরে চোখের জমিতে বিরল জলের ফোঁটা ভেসে ওঠে। যন্ত্রণার মর্মান্তিক গভীর ছাপ পড়ে মুখে।

—দিদি, দিদি আমায় অবিশ্বাস করলো—তুই যে আমার সে-ই দিদি…

এই তাহলে ব্যাপার। এতদিনে যেন মিতার দিদিকে কতকটা বুঝতে পারি। ধর্ষিতা হয়েছিলো মিতা। সমাজ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলো তার চরিত্র সম্পর্কে। যেন নষ্ট চরিত্র না-হলে কাউকে ধর্ষণ করেনা লম্পটেরা। যেন কেউ নষ্ট চরিত্র হলেই তাকে ধর্ষণ করার অধিকার জন্মায় লম্পটদের।

কিন্তু সমাজের সন্দেহ আর অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারার ব্যাপারে মিতার অক্ষমতা—দুটিকে জোর করে মেলালে সমাজের মনমতো দু'য়ে-দু'য়ে চার হয়ে যায়। তা হয়তো মিতার দিদিকে বাঁচায় এক পাগল-করে-দেয়া টানাপোড়েন থেকে। মা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর নির্দেশ মেনে নিয়ে শান্তি না পেলেও স্বস্তি হয়তো পায়।

ধর্ষিতা বোনের সঙ্গে সব সম্পর্ক বন্ধ করে দেয় সে। আর মিতার কেস ঢিলে হয়ে যায়। অভিযুক্তদের জামিন হয়। কেসের কাগজপত্র চাপা পড়ে যায়—এবং অজ্ঞাত কারণে মিতা বদলি হয়ে আসে মহানগরীর এই বড় জেলে।

—কিন্তু কেন ? তুই চিনিয়ে দিলি না কেন কালভার্টে বসা বজ্জাতগুলোকে ?

—দিদি, কালভার্টে অন্তত জনা পনের-বিশ ছেলে বসে থাকতো। সেদিন তাদের মধ্যে কারা এই কাণ্ড করেছিলো—আমি যে বুঝতে পারিনি দিদি…॥

অসহায়ভাবে বলতো মিতা।

—ওঃ মিতা, অসহ্য আবারও বলছি অসহ্য। নাই বা চিনতে পারলি সেই রাত্তিরে কাউকে…কালভার্টে যারা বসতো আদেরই চিনিয়ে দিতি…

—যাকে চেনাতাম সে যদি না থেকে থাকে ঐ দিন ?

—কি হতো তাতে ? ঐ রেপিস্ট বদমাসদের সঙ্গে কি ভালো ছেলেরা থাকে ?—সবকটাই বদমাস। ওদের মধ্যে যেই সাজা পাক—উপযুক্ত শাস্তি হ'তো তার। ঠিক হতো। ওদের মধ্যে যদি সত্যিই নির্দোষ ভালো কেউ থাকতো, তবে সে নিশ্চয়ই অন্যদের এই জঘন্য কাজে বাধা দিতো।

—কিন্তু আমি যে অন্য কথা ভেবেছিলাম।

—কি?

—ভেবেছিলাম যা সত্যি—তা বলাই উচিত আমার। ভেবেছিলাম সবকজন দোষী যদি আমার সাক্ষ্যের কারণে বেঁচেও যায়—কিন্তু একজনও নির্দোষ যেন আমার ভুল সাক্ষ্যে সাজা না পায়—তবে আমার দোষ লাগবে!

স্তম্ভিত হয়ে যাই শুনে। যারা মিতাকে সন্দেহ করে, নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ভাবে—তারা হয়তো শুনে বলবে এসব 'সাজিয়ে-বানিয়ে বলা। চালু মেয়ে।' কিন্তু ক্লাস এইট পাশ-করা আচারের শিশিতে লেবেল লাগানোর কাজ-করা একটি মেয়ে ন্যায় বিচারের মূল সূত্রটিকে এমন অনায়াসে বলতে তো পারে। কে এমন পারে? কজন পারে? নিজে জেল খাটতে-খাটতে এমন ক্ষোভশূন্য ন্যায়বাক্য কজন উচ্চারণ করতে পারে?

কি হতো, এই মেয়েটা যদি একটু সম্পন্ন ঘরে জন্মাতো? একটু সুযোগ সুবিধা পেতো? বিষয়-পিছু একজন করে গৃহ-শিক্ষক, দামি কোচিং নামী স্কুল, এসব কোন কিছুরই দরকার ছিলো না ওর। একটু ভরপেট খাদ্য, একটি স্নেহপূর্ণ সহৃদয় পরিবার, দু-বেলা নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করতে পারা, এবং নিরুদ্বেগ একটি জীবন তাকে পৌঁছে দিতে পারতো সমাজের লোভনীয় যে কোনো উচ্চতায়।

রাষ্ট্র-বিরোধী, সরকারের বুকে ভয় ধরিয়ে-দেয়া কোনো বিপ্লবী নেত্রী হওয়ার উপাদান, তার অত্যাচারিত জীবনে আছে। আবার রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত প্রতিভাশালী কোনো রাজনৈতিক নেত্রী হয়ে ওঠাও অসম্ভব ছিলো না তার পক্ষে। দার্শনিক অথবা অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক কিংবা শিক্ষাবিদ, প্রথিতযশা আইনজীবী, নামকরা লেখিকা কোনোকিছু হওয়াই অসম্ভব ছিলো না এ মেয়ের কাছে।

তাই বুকের ভেতর তোলপাড় ওঠে মিতাকে দেখে—মিতার কাহিনী শুনে।

কি অসাধারণ জীবনের কি অসাধারণ অপচয়—এই জেলখানায়!!

* * *

এসব কথা বসে যখন ভাবি—মিতার ওপর রাগও হয়। মেনে নিতে পারিনা তার ঔদার্যকে।

—তোর কি উচিত হয়েছে ওই বদমাইসগুলোকে ছেড়ে দেয়া? ওইসব মাস্তানদের ওপর কোন সহানুভূতি নেই আমার। সত্তরের ওই সময়ে চূড়ান্ত বদমাস ছাড়া এসব কাজ করতেই পারেনা কেউ। ঘাঘু ক্রিমিনাল তারা—ওই কালভার্টে-বসা মাস্তানের দল—না জেনেও বাজি ধরতে পারি আমি। ওদের যে-কেউ সাজা পেতো—জেল খাটতো কি নরকে যেতো—খুশী হতাম—এমনটা হওয়াই উচিত ছিলো…

—তুমি বলছো? দিদি রাগ করলো দেখে আমিও তাই ভেবেছিলাম। ভুল হলো বোধহয় আমার। ভীষণ ভুল। সব কটা দেখা-শোনা মুখকেই শনাক্ত করা

উচিত ছিলো বোধহয়,—একথা ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছি দিদি। বহুৎ দিন কষ্ট পেয়েছি।…

কিন্তু দুবছর জেলখাটার পর মনে হয় আমি ঠিকই করেছিলাম। কোনো ভুল করিনি।

—কেন রে মিতা ?

—কি সাজা হয় দিদি রেপ করলে ? ফাঁসী তো হয় না। আমাকে মেরে ফেলতে পারলে হতেও পারতো—আমি যে বেঁচে আছি…

তিক্ত হাসে মিতা। হয়তো তার বেঁচে যাওয়া জীবনের কথা মনে করে।

—তাতে কি ? তুই শনাক্ত না-করায় কেস তো আরোই হাল্কা হয়ে গেলো…

—নইলে ? ওদের শাস্তি হতো ? ক বছর ? তিন বা বড়জোর পাঁচ।

আমিই তো দু বছর জেলে রয়েছি দিদি। আর তিন বা পাঁচ বছর জেল খেটে তাদের কি চরিত্র সংশোধন হয়ে যেতো ? ক্রিমিনাল থেকে আরও পাক্কা ক্রিমিনাল হয়ে বের হতো না ?

আর ওদের সঙ্গে নিরপরাধ একটি ছেলেও যদি সাজা পেতো—পাঁচ বছর পরে জেল তাকে একটি দাগী ক্রিমিনাল করে ছেড়ে দিতো।

—আর আগে ? ক্রিমিনাল ছিলো না তারা ?

—ছিলো দিদি—জেল খেটে দু-চার বছর আরও দাগী বদমাস হতো—কি-ই বা দুই বা পাঁচ বছর এক জীবনে—আমিই তো দুবছর এখানে। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার এটুকু তো শাস্তি। কিন্তু এই যে ছাড়া পেলো…আমি চিনতে পারলাম না …সত্যি কথা বললাম…ওদের একটু লজ্জা একটু বিবেক থাকলেও মনে লাগবে। এত বড় সর্বনাশ করলো আমার…তবু আমি ওদের ক্ষতি করলাম না। এসব দেখে হয়তো মনে লাগবে ওদের…হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবে…দুপাঁচ বছর জেল খাটার চেয়ে এতেই ওদের ভালো হয়ে যাওয়ার চান্স বেশী…হতে পারেনা দিদি এমন ?
এমন হয় না ?

যেন স্বপ্ন দেখছে—এমনভাবে জিজ্ঞেস করতো মিতা। আমাদের গলার কাছে ব্যথা করতো। বুকের ভেতর শিরশির করতো।

কি মেয়ে ? কেমন মেয়ে ? কি দিয়ে তৈরী ওর মস্তিষ্ক ? ওর হৃদয় ?

এক নিম্নবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারে অমন এক মায়ের গর্ভে ও কোথা থেকে জন্ম নিলো ?

*　　　*

তারপর ধীরে ধীরে আরও অনেক কথা বলেছে মিতা। অনেক কাহিনী। ঘটনা।

মিতার সঙ্গে দেখা করেছিলো গ্রেপ্তার-হওয়া ছেলেদের মা-বাবারা। তারা টাকা দিতে চেয়েছিলো মিতাকে। মিতা যে গরীব। তাই ওদের এমন দুঃসাহস। মিতা যদি তাদের ছেলেদের শনাক্ত না করে বা কেস গুলিয়ে দেয়—তবে অনেক টাকা পাবে মিতা—এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো তারা।

সে প্রস্তাব নিয়ে মিতার বাড়িতে—মিতার মায়ের কাছেও লোক গেছিলো।

ঘৃণাভরে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলো মিতা। মিলিয়ে বাড়িয়ে কুড়ি-তিরিশ হাজার টাকা হয়তো হয়ে যেত মিতার ইজ্জতের দাম ঐ নরশ্রেষ্ঠদের বিচারে। কিন্তু এই দাম হারাতে হলো দেখে মিতার ওপর স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন মিতার মা।

আর মিতার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক কৌতুক হলো এই যে, তারপর মিতা কাউকে দোষী বলে শনাক্ত করতে পারলো না।

এবার মাথা গুলিয়ে গেলো মিতার দিদিরও। আর বেশ নিপুণভাবে সর্বনাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলো মিতার। জেলখানাই হয়ে গেলো তার স্থায়ী ঠিকানা।

তার যে দিদি—অত কাছের মানুষ—অত ভালোবাসার দিদি—তারই মাথা গুলিয়ে গেছিলো মিতাকে বুঝতে-বুঝতে।

আর আমরা? আমরাই কি বুঝেছিলাম তাকে? তার মনের বিচিত্র ওঠা-পড়াকে? সরলরেখার মত করে মানুষের মন বুঝতে অভ্যস্ত আমরা—মানুষের মনোজগতের জটিলতা বুঝতে শিখিনি—যখন অসাধারণ ভাবতে আরম্ভ করেছি মিতাকে—তখন ভুলে গেছি সেও মানুষ। ষোল সতের বছরের এক কিশোরী মাত্র। এই জেলখানায় তার ভালো লাগেনা। আর সহ্য হয়না এই জেলবাস।

যদি এসব বুঝতাম—তবে কি রক্ষা করতে পারতাম তাকে? আমাদের অমন শ্রদ্ধা—অমন ভালোবাসার মিতা—তাকে যে এভাবে হারাবো ভাবিনি কখনো।

*   *

কত গল্পই না করেছি মিতার সাথে। কত কথা বলেছি।

সমাজ, সংসার, সরকার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি, ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য, সব নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত—দেশভাগের ঘটনা, বাংলাভাগের ঘটনা, তাতে নেহেরু-গান্ধি-জিন্নার ভূমিকা। নেতাজী সুভাষ বোসের কথা, ক্ষুদিরামের কথা, ভগৎ সিং-এর কথা।

আলোচনা করেছি সাম্প্রতিক রাজনীতি। আমরা কেন জেলে বন্দী।

সমাজতন্ত্র কি, ধনতন্ত্র কাকে বলে, সামন্তবাদ কি। ভারতবর্ষটা কেমন দেশ—কোন নীতিতে চলে। আমেরিকা বা ব্রিটেন, রাশিয়ায় কি ঘটেছিলো—চীনের মানুষ কি অবস্থায় আছে—ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাটা কি। এইসব কিছু আমরা আলোচনা করেছি মিতার সাথে। নিজেদের যথাসামান্য জ্ঞানবুদ্ধির ঝুলি উজাড় করে দিয়েছি মিতার সামনে—আশা করেছি এইসব কিছু তাকে জানাতে পারলে সে হয়ে উঠবে এমন অসাধারণ এক মেয়ে—যার মত হওয়ার কথা আমরাও কখনো ভাবতে পারবো না।

খুব মন দিয়ে সব কথা শুনতো মিতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট প্রশ্ন করে সে জেনে নিতো তার জ্ঞাতব্য সব তথ্য। কোনো কথা তাকে বোঝাতে চাইলে—সে অতি অনায়াসে তা বুঝে নিতে জানতো।

আমাদের সমাজব্যবস্থার গলদগুলো কোথায়, আমাদের আইন—পুলিশ—সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন—এবিষয়ে তাকে বিশেষ বোঝানোর দরকার ছিলো না। আমাদের থেকে অনেক তীব্রভাবে সে পরিবর্তনের আকাংখী ছিলো। সমাজব্যবস্থার সেই মানবকল্যাণকারী রূপ, সেই পরিবর্তন কোন পথে আসতে পারে, তা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আমরা আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাস অনুসারে।

মিতা সবচেয়ে ভালোবাসতো আমাদের গানগুলোকে। রীণা আর পুতুলকে নিয়ে ডিগ্রীঘর বাসের সময় গান করেছিলো মিতা। ভয়কে তাড়াতে চেয়েছিলো পুতুলের মন থেকে—সে গান গেয়ে। আমাদের গাওয়া গানের প্রতি তার এই ভালোবাসা ছিলো একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিক। কোথা থেকে একখানা আট নম্বরী সাদা খাতা জোগাড় করেছিলো সে। যেসব গান আমরা গাইতাম—বসে বসে ধৈর্য ধরে শুনে শুনে সেই সব গানের কথাগুলো সে লিখে নিয়েছিলো খাতায়। এবং নির্ভুলভাবে গান সে গাইতে পারতো। শুধু নির্ভুলভাবে নয়—সময়োপোযোগী করেও গাইতে পারতো সে। যেমন গেয়েছিলো ভয় পাওয়াতে চাওয়া ডিগ্রীঘরের সেই রাতে—

—মোরা দুঃখকে করিনা ভয়

আমরা যেসব গান গাইতাম সেগুলো অবশ্য খুব জনপ্রিয় ছিলো গোটা মহিলা ওয়ার্ডে। যদিও 'বোকা বুড়োর গান'-জাতীয় দু চারটে গান ছাড়া বাকি গানগুলোতে ঠিক সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখকষ্ট বা সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ক কোনো কথাবার্তা ছিলো না।

গানগুলোকে বলা যায়—যারা কোনো আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে—তাদের নিজেদের উদ্বুদ্ধ করার মতো গান। যাকে অনেকে 'পার্টিজান' গান বলতো।

আমরা এগুলো শিখেছিলাম একে অন্যের মুখে শুনে শুনে, একজন থেকে আরেকজন। আমাদের নিজেদের টিঁকে থাকার প্রয়োজনে, অত্যাচার আঘাত আর বিপদের মুহূর্তে, নিজেদের সতেজ ও উজ্জীবিত রাখার প্রয়োজনে, এইসব গান আমরা গাইতাম।

'পার্টিজান গান' বলে কথিত এসব গান কিন্তু সত্যিই বিপুল জনপ্রিয় ছিলো গোটা মহিলা ওয়ার্ডে।

সুরের অবশ্য তেমন কোন বৈচিত্র ছিলোনা এসব গানে। আদিতে হয়তো ছিলো, কিন্তু মলয়া, বোমা এবং কৃষ্ণা বাদে আমাদের আর কারুর গলায় সুরলক্ষ্মীর দয়ার কোনো ছোঁয়াও ছিলো না। ফলে সব গান গুলোকেই শেষ পর্যন্ত আমরা এক ছাঁচের সুরে সমবেত হেঁড়ে গলায় গাইতাম। খুব আন্তরিকতা নিয়ে যে গাইতাম, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হয়তো গানের সে আন্তরিকতা—হয়তো গানের মধ্যে ধ্বনিত প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার সুর তাদের ভালো লাগতো। কিংবা শুধু গান বলেই এগুলো তাদের ভালো লেগে থাকতে পারে।

এ জেলে তো কোনো গান নেই। এখানে শান্তিমাসীদের মত অপ্রতিরোধ্য দু'চারজন ছাড়া কীর্তন গানও কেউ করে না।

যে জন্যই হোক জেলের প্রায় সবাই এই গানগুলোকে ভালোবাসতো। এমনকি মেট্রনের চামচারাও। শিখা থাকতে, এ গানের প্রভাব এড়াতে পারতো না বলে গানগুলো অশ্লীল প্যারডি করে গাইতে চেষ্টা করতো। বাকিরা নিজেদের অজান্তেই ভাটিঘরে কিংবা হাসপাতালে গুনগুন করতো আমাদের গান।

এ গান হাসিনা-হাওয়ারা গেয়েছে, মুন্নি-হামিদারা গেয়েছে, রিংকু গেয়েছে, শোভা গেয়েছে। তারা এক একজন ভালোবাসতো এক একটি গানকে। কিন্তু মিতার মত এমন প্রাণ দিয়ে প্রতিটি গানকে যেন আর কেউ ভালাবাসেনি। গান লেখা সেই আট নম্বরী খাতাটি তার শরীরের ভিতরেই লুকোনো থাকতো সাধারণত। তাল্লাসীর সময় নজর পড়লে জেল-কর্তৃপক্ষ নিয়ে নেবে—এই ভয়ের সঙ্গে তার ছিলো অদ্ভুত এক মমতা—খাতাটির প্রতি। সঙ্গেই রাখতো সব সময় খাতাটিকে।

আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রায়ই সে খাতাটা নাড়তো, চাড়তো, দেখতো, হাত বোলাতে অদ্ভুত মমতায়। আবার যথাস্থানে রেখে দিতো।

তারপর কত কথাই যে বলতো একফোঁটা অতটুকু একটা মেয়ে—আরও বছর খানেক যার সাবালিকা হ'তে তখনও বাকি।

—আচ্ছা দিদি, তোমরা ছেলেগুলোর দোষ দাও—কিন্তু ওরা ভালো হবে কোত্থেকে বলো দেখি—ছেলেরা এতবড় দোষ করেছে—সর্বনাশ করেছে একটা মেয়ের—তা জানার পরও সেই মেয়ের কাছে এসে টাকা দিতে চায়—কেস গোলমাল করে দিতে বলে যারা—তারা কি মানুষ ? আর অমানুষের ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে কি করে ?

বলতে পারতাম—তোর মায়ের যে গল্প বলিস, সে মায়ের মেয়ে তুই কেমন করে হলি ? কিন্তু বলতাম না। কেন বা শুধু-শুধু দুঃখ দেবো ওকে। বলতাম, খারাপ পরিবেশে যে জন্মায়, তার হয়তো খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থকে—তবু যে খারাপ পরিবেশে থেকেও তাকে অতিক্রম করে ভালো থাকে—সে অসাধারণ মানুষ হয় মিতা। আর বেশীর ভাগ মানুষ ভালো এবং মন্দ মেশানো পরিবেশেই বড় হয়। সেই পরিবেশ থেকে কেউ ভালোটুকুকে বেশী নিয়ে ভালো হয়—কেউ মন্দটুকুকে বেশী নিয়ে মন্দ হয়। কিন্তু প্রতিকুল পরিবেশকে অতিক্রম করে ভালো হতে পারে যে, সে-ই তো মানুষের মত মানুষ। এসব বললে, মিতা শোনে। চেয়ে থাকে। কিভাবে জানিনা, তবু কখনো-কখনো ওকে অচেনা লাগে।

অনেক দিন ধরে আমরা পরস্পরকে চিনি। পরস্পরকে ভালবাসি। পরস্পরকে বিশ্বাস করি। বহুদিনের এ সম্পর্ক। তবু জীবনের এক অন্য মুখ সে দেখেছে। সেই ঘৃণা আর বেদনার অভিজ্ঞতায় সে আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। সেইজন্য মাঝে-মাঝে মনে হয়, তার মনের কাছে হয়তো আমরাও পুরোপুরি পেঁছোতে পারি না।

* * *

ওয়েল-ফেয়ার দিদি চলে গেছিলেন। কিন্তু মিতার জন্য একটি কাজ তিনি করে গেছিলেন। মিতার দিদির সঙ্গে মিতার যোগাযোগ।

শেষ পর্যন্ত মিতার দিদি দেখা করতেও এসেছিলো বোনের সঙ্গে। বলে গেছিলো মার মন নরম করার প্রাণপণ চেষ্টা সে করছে। মা নিমরাজি হলেও নিয়ে যাবে মিতাকে। তৎক্ষণাত।

তারপর একদিন মিতা এলো হাসিমুখ নিয়ে। দিদি কথা দিয়েছে। উকিল ধরেছে—এখন তারিখ হলেই ছাড়িয়ে নেবে মিতাকে।

তারপর সত্যিই মিতার 'রিলিজ' এলো। আরও একটি আনন্দের দিন। মীরার মুক্তির দিনেও আনন্দ ছিলো। তবু কোথায় যেন ছিলো আশংকা।

মিতার মুক্তির দিনে ছিলো শুধুই আনন্দ। দু-বছরের বেশী জেল খেটেছে সে। আরও বছরখানেক পর সাবালিকা হয়ে যেতো। মিতা যেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে—হয়তো নিজে ব্যবস্থা করে ছাড়া পেতে পারতো সাবালিকা হয়ে গেলে। তবুও শেষ পর্যন্ত দিদি তো এসেছে। ফিরিয়ে দিয়েছে মিতাকে তার সবচেয়ে দামী জিনিসটা। দিদির প্রতি মিতার একান্ত নির্ভরতা ও বিশ্বাস। এটাই সবচেয়ে বড় লাভ।

একটি বড় ক্ষত যে ওষুধের প্রভাবে নিরাময় হতে শুরু করে—সে ওষুধ ছোটো ছোটো ক্ষতগুলোকে একই সঙ্গে শুকিয়ে ফেলে। মিতার মনের ক্ষতগুলোও নিশ্চয়ই এবার শুকিয়ে যাবে। ও যে মিতা। সব আছে ওর। বুদ্ধি বিবেচনা, হৃদয়, সাহস এবং উদারতা—সব। কেবল ও হাসে না কখনো। এই দু বছরে ওকে কখনো স্বতস্ফূর্ত আনন্দে হেসে উঠতে দেখিনি। এবার নিশ্চয়ই ও হাসবে আবার প্রাণভরে। কেমন লাগবে তখন মিতাকে দেখতে? আমরা ভাবি।

বোধহয় মাস চারেক পরে একদিন সকালে হাসিনা আসে। মেয়াদি নম্বরের জানলা ধরে দাঁড়ায়। আমাদের ডাকে। কি যেন বলতে গিয়েও দ্বিধা করে হাসিনা। শেষে বলেই ফেলে—দিদি, মিতা আবার এসেচে গো।

—সেকি রে? মিতা? মিতা কেন? মিতা কেন আবার? তবে কি মিতাকে দিদি আর রাখতে চাইলো না? কিন্তু তাতেই বা কি? ও তো জনারণ্যে মিশে যেতে পারতো, হারিয়ে যেতে পারতো, ও তো খাটতে ভয় পায়না—কোথাও পরিশ্রম করে জোগাড় করতে পারতো পেটের ভাত। আবার জেলে কেন এলো মিতা?

—হাসিনা, ডেকে আন না রে ওকে—ও হাসিনা।

হাসিনা তৎক্ষণাত ডাকতে যায়। ফিরে এসে জানায়, একটু পরে আসবে মিতা বলেছে।

অবাক হই, জেলে এসেই যার ছুটে আসার কথা আমাদের কাছে—এত দেরী সে কেন করছে? তবুও অপেক্ষা করি। সারাদিন। মিতা আসে না। একবার এক

মুহূর্তের জন্যও নয়। দিন চলে যায়—যথানিয়মে রাত আসে। দমবন্ধ করা এক প্রতীক্ষার রাত।

সকালে শুধু হাসিনাই নয়—অনেক ব্যথিত, উৎসুক এবং নিন্দুক মুখ খবর নিয়ে ছুটে আসে মেয়াদি নম্বরের জানলায়।

—মিতা চলে গেছে, মিতা ছাড়া পেয়েছে।

কাউকে কোনো প্রশ্ন করি না। একটি কথাও বলি না কারো সাথে। এক রাত জেল খেটে ছাড়া পাওয়ার অর্থ তো আর এত বছর জেল-খাটার পর অজানা থাকতে পারে না।

পেটি কেস। পতিতাবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য একরাতের হালকা শাস্তি।

মিতা!

যেন মাথা খারাপ হয়ে যাবে এমন লাগতে থাকে সারাটা দিন। সারাটা রাত।

তারপর দশবারো দিন পর মিতা আবার জেলে আসে। এবার আর তাকে ডেকে পাঠাই নি। সে নিজেই এলো এবার। বসলো মেয়াদি নম্বরের জানলায়। আমাদের দিকে তাকালো না। আমাদের চোখে চোখ মেলালো না। তাকিয়ে রইলো মেয়াদি নম্বরের নোংরা ঘোলাটে সাদা দেয়ালের দিকে। কথা শুরু করলো বিনা ভূমিকায়।

—এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না, দিদি।' বলে সে চুপ করে রইলো। হয়তো ভেবেছিলো, আমরা কিছু বলবো—কোনো প্রশ্ন করবো তাকে—কিন্তু আমরা একটি কথাও বলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করলো সে। তারপর নিজেই বললো—আসলে মা রাজি হয়নি। কিন্তু আমাকে দেখে যাবার পর দিদির আর মনও মানছিলো না। জেলে ফেলে রাখতে পারছিলো না আর। ভেবেছিলো আমাকে দেখলেই নরম হয়ে যাবে মা। সৎ মা তো আর নয়। তার পেট থেকেই তো জন্মেছি আমি। মা কিন্তু একটুও নরম হলো না। বললো, আমি বাড়িতে থাকলে মা ছোট দুই বোনকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। সে এক হুলুস্থুলু বাড়িতে। শেষে রাগ করে দিদিই আমাকে নিয়ে আলাদা বাসা ভাড়া করলো।

কিন্তু তাতে কি আর দুই সংসারের পেট ভরে? মা আমাকে নিয়ে থাকবে না দিদির সাথে। কিন্তু দিদির টাকা তো নিতো। টাকার টান পড়লে ছোটো বোনকে দিদির কাছে পাঠাতো—টাকা নিতে। দিদি আর চালাতে পারছিলো না। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় পাগল হ'তে বসেছিলো। এক প্রাইমারী স্কুলের মাইনেতে কি দু সংসার চলে?

চাকরির জন্য কত চেষ্টা করলাম। কোথায় যাবো? পুরোনো কারখানা থেকে

তো বলতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলো। সেখানে পুলিশ গেছিলো খোঁজ নিতে। তারা সব জানে।

চেনাজানা যেখানেই যাই—দেখি আমার বদনাম গেছে আগে। কোথাও চাকরি পেলাম না। দু-বছর জেলে ছিলাম—চেনাজানা অন্যসব লোকজন কে কোথায় গেছে, বদলে গেছে—কিছুতেই লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করার একটা কাজও পেলাম না।

ওদিকে দিদির মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। শেষে মনে পড়লো। জেলে আমাদের মত মেয়েদের তো কত কে কত কিছু বলে যায়—জানো তো তোমরা দিদি। কত মেয়ে ওইসব জায়গার কত ঠিকানা দিয়ে গেছে।

এই রকমই একটা মেয়ের সাথে ধর্মতলায় কাছে দেখা হয়ে গেলো। খুঁজে বের করেছিলাম তার ঠিকানা। মেয়েটা আমায় দেখে খুব খুশী।

বললো···নেমে পড়ো লাইনে, দিন কেটে যাবে। ধরো গে কেউ রেপ করলো তো তুমি নষ্ট মেয়ে হয়ে গেলে—তবে আর লাইনে লজ্জা কি ? তোমার মত কেস অনেক এ লাইনে—পেত্থম পেত্থম একটু খারাপ লাগবে, পরে সব অভ্যেস হয়ে যাবে দেকো।'

মিতা বলছিলো। আমরা শুনছিলাম। কিন্তু একটি কথাও বলিনি। ওকে সহানুভূতি জানাই নি, সমবেদনা প্রকাশ করি নি, সমর্থন করি নি—নিন্দাও নয়।

শুধু বসেছিলাম চুপ ক'রে।

আমাদের সেই নীরবতা দেখে মিতা ধীরে ধীরে চুপ করে গেলো। কতক্ষণ ? মনে নেই। বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা সবাই।

শেষে মিতাই আবার কথা বললো। এতক্ষণ পরে সে আমাদের দিকে তাকালো চোখে চোখ রেখে। তার ছোট ছোট চোখে অদ্ভুতভাব ফুটিয়ে হাসলো। যেন একটু দ্বিধা করলো—একটু লজ্জা পেলো। তারপর বুকের ভেতর হাত দিয়ে টেনে বের করলো সেই আটনম্বরী খাতাটা। সেই গানের খাতা।—দিদি দেখো, এটা আমি হারাই নি, কাছ ছাড়া করিনি। রোজ এই গানগুলো গাই আমি ওখানে। ওখানেও সবাই ভালোবাসে গানগুলোকে। আমি কি আর চিরটাকাল ওখানে পড়ে থাকবো ? আমি ফিরে আসবো দিদি। সন্ধ্যায় লাইনে দাঁড়াই, দিনের বেলা টুকটাক বেড়িয়ে পড়ি—চাকরি খুঁজি, যা হোক একটা চাকরি পেলেই···চলে আসবো। সবাই তো খারাপ মেয়েই বলে। নয় ঘণ্টা দিন সত্যি সত্যি খারাপ হলাম···জেলে আর ভালো লাগে না দিদি···কেন জেল খাটবো আমি ? মাও নেবে না, দিদির এই অবস্থা—তাই বলে কি চিরটাকাল এইসব করবো নাকি ? না, না, দিদি দেখছো গানের খাতাটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, কখনো এটাকে হাতছাড়া করি না। আমি আবার চলে আসবো দিদি, দেখো···দিদি, আমি···দিদি···

মিতা অনর্গল তার স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে বেশী কথা বলছিলো। হঠাৎ বোধহয় আমাদের নীরবতা লক্ষ্য করেই একেবারে চুপ করে গেলো। বুকের ভেতর যত্ন করে ঢুকিয়ে নিলো খাতাটা।

আর কোনো কথা হলো না। ও-ও চুপ করে রইলো, আমরাও। সবাই চুপ করে বসে রইলাম। মাঝখানে রইলো লোহার গরাদ। উভয়ের মধ্যখানে যে গরাদ চিরদিন রয়েছে। কখনো ঘোচেনি। একটুখানি হলেও, তৈরী করে রেখেছে বিরাট ব্যবধান।

আমরা তো কখনো জানতে পারিনি এত তিক্ত হয়ে উঠেছে মিতা চারপাশের নিন্দা শুনতে শুনতে। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাও কমে গেছে তার—তাতো ভাবিনি। বুঝতেও পারিনি কখনো, জেলখানা মিতাকে চিনিয়ে দিয়েছে দেহ বিক্রি করে বেঁচে থাকার রাস্তাটি। বুঝিনি বন্দীদশার চেয়ে সেই লাঞ্ছিত জীবনও ভালো ব'লে কবে থেকে ভাবতে শুরু করেছে মিতা।

বহুক্ষণ বসে থাকে মিতা। তারপর চলে যায়। যাওয়ার আগে নিয়েযায় গানের খাতাটা।

আশ্চর্য হয়ে বসে থাকি। মিতা কি বাড়িয়ে বলে গেলো, আমাদের কাছে তার লজ্জা ঢাকতে? নাকি সত্যি সত্যিই কোনো এক পতিতাপল্লির মেয়েরা এইসব গান গায় সেখানে বসে? আর কেনই বা এই মেয়ে এতদিন—এত ঝড় ঝাপটার পরেও বুকের ভিতর সেই গানের খাতা নিয়ে ঘোরে?

* * *

কখনো কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় বুকের বোঝা তাতে হাল্কা হবে। কিন্তু কান্না আসে না। কেবল আসে স্মৃতিরা—মিতাকে জড়িয়ে অসংখ্য স্মৃতি মনে পড়ে।

আর মনে হয়, চলে গেছে মিতা। হয়তো কোনদিন আর সে আসবে না। আর হয়তো কোনদিন তাকে দেখবো না।

* * *

না, সত্যিই সে আর আসেনি। আর কখনো দেখিনি তাকে।

তবু কতবার এসেছে সে। জেলের অন্ধকার রাতে। কতবার ঘুম ভেঙে গেছে কি যেন এক মন খারাপ-করে-দেয়া ভাবনায়। মনে পড়েছে সেই মেয়েটাকে। যার সব ছিলো। অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা, অসাধারণ হৃদয়। শুধু তেমন রূপ ছিলো না তার।

আজ কি সেই রূপেরই বেসাতি করার জন্য পতিতাপল্লির ধারে দাঁড়িয়ে থাকে সে?

আর তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখারও যোগ্যতা যাদের নেই, তারা টাকা-আনার দরে নির্ধারণ করে সেই অমূল্য মেয়েটির দাম কিংবা প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়?

শুয়ে-শুয়ে জ্বালা-ধরা চোখ চলে যায় জেলের পাঁচিলে। মনে হয় কুৎসিত, বিবর্ণ সে প্াঁচিল যেন বিদ্রূপ করে আমায়। বলে—কি? ভেবেছিলে না, নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির ঝুলি উজাড় করে দিয়ে অসাধারণ মিতাকে অনন্যসাধারণ করে তুলবে? ভেবেছিলে না, তাকে রাজনীতি শেখাবে? প্রতিবাদ করতে, সমাজকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে লড়াই করতে শেখাবে?

দেখো, কত নগণ্য তোমাদের শক্তি—আর কত বেশী শক্তি রাখি আমি। দু'বছর আটকে রেখে তোমাদের 'অসাধারণ' মিতাকে কেমন আর পাঁচটা মেয়ের মতই বেশ্যাপল্লির রাস্তা চিনিয়ে দিলাম। অসাধারণ হোক কিংবা সাধারণ, বেশ্যাই তো তাকে হতে হলো শেষ পর্যন্ত। জেলে না এলে মেয়েদের বেঁচে থাকার এই রাস্তাটি কি আর সে এত সহজে চিনতে পারতো?

মাথার নিচের রুক্ষ কম্বল টেনে নেয় চোখের জল। চোখের জলে সে ভিজে ওঠে না, বরং চোখ মুছতে গেলে বাড়িয়ে দেয় জ্বালা।

আধো ঘুমে, আধো জাগায়, জেলের পাঁচিলকে আমি বলি—নিশ্চয়ই তোমারও লজ্জা করে। তুমি তো মানুষের হাতেই তৈরী…মিতার মত মেয়েকে ওই পথে নিয়ে গিয়ে কী করে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো অমন খাড়া হয়ে?

সকাল বেলার আলো এসে বিভ্রম কাটিয়ে দিলে দেখি, যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনই দাঁড়িয়ে আছে জেলের পাঁচিল। কোথাও একটু অনুতাপের ফাটল ধরেনি। লজ্জায় একটুও নুইয়ে পড়েনি তার খাড়া মাথা।

বরং দেখি, পাহারাদারের তত্ত্বাবধানে ঘেরাও হয়ে আসে রাজমিস্ত্রি, তার নিপুণ হাতের কর্ণিক সিমেন্ট আর ইঁটের গাঁথুনিতে আরও উঁচু, আরও দুর্ভেদ্য করে তোলে পাঁচিলকে।

মিতা, আমি যে নিজেই এখন আর বুঝতে পারি না—বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা ওই গান গেয়ে তোরা ডিঙিয়ে যেতে পারবি কিনা চারদিক থেকে ঘিরে-ধরা দুর্ভেদ্য পাঁচিলকে।

তবু তারই জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি রে মিতা।

'পাগলবাড়ি পর্ব' নামে প্রকাশিত লেখাগুলো ছাড়া অন্য পর্বের এই গদ্যটি এখানে সংকলিত হোলো। স্পন্দন ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই অন্য পর্বের আরেকটি গদ্য প্রকাশিত হয়েছিলো। জেলখানায় অত্যাচারিত অসহায় শিশু সম্পর্কে-সেই লেখাটির শিরোনাম ছিলো: 'শংকর'।

রচনাকাল: মার্চ, ১৯৯০

বিমল চৌধুরীর গল্প

সোয়াদ

ডাইনিং-টেবলে বসে কাঁটা-চামচের প্লেটে নজর পড়ায় ওরা একটু দমে যায়। ওরা মানে অমল আর মিহির। টেবলে সাজানো নানা রকমের গরম গরম লোভনীয় খাদ্য থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্বাদু গন্ধে ম' ম' ডাইনিং রুম। উল্টোদিকে মুখোমুখি বসা ওদের হোস্টের নজর এড়ায় না। 'কাঁটা-চামচের দরকার নেই, জুৎ করে হাত দিয়ে খাও ভাই।' এবং তিনি ইঙ্গিত করা মাত্র, বেয়ারা হাতের নিচে পাত্র ধরে জগ্ থেকে জল ঢালে। ওরা হাত ধুয়ে নেয়।

সারা-টা টি-গার্ডেন এলোপাথারি চক্কর-টক্কর দিয়ে এসে, গরম জলে চান-টান করে দুপুরের খিদে-টা বেশ চাগিয়ে উঠেছে। ওদের ডিশে সুগন্ধি সরু চালের ভাত, ভাজাভুজি, ডিশের পাশে কয়েকটি বড়ো বাটিতে অপেক্ষায় রয়েছে রসনাতৃপ্তি আর উদরপূর্তি'র জন্য নানাভাবে রান্না করা মোরগ, পাঁঠার আইটেম। তর সইছে না, শুরু করে দিলেই হয়। সায় নিতে ওরা, ওদের হোস্ট্-এর হাত আর ডিশের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, ফ্রীজ হয়ে যায়।

…আমার মতো আপনারাও অথবা আপনি, অবাক হচ্ছেন তো? শ্রদ্ধেয় পাঠক-বৃন্দ, বৃন্দ না হলেও, একজন পাঠক অন্তত 'সোয়াদ' লেখা-টা পড়ছেন, পুরো ঘটনা-টায় আমার পাশে আছেন, এ বিশ্বাস নিয়েই জিজ্ঞেস করছি। এবং পাঠক পড়ছেন, এ বিশ্বাসে মগ্ন লেখক লিখে চলেন। লেখক-পাঠকের সম্পর্ক মাছ আর জলের মতো, তাহলে আপনিও আসুন না আমার সঙ্গে। পাশে দাঁড়ান, ব্যাপার-স্যাপার দেখে যান, ওরা কেউ আমাদের দেখছেন না তো, তাহলে সঙ্কোচ কি! অবিশ্যি একটা-ই ফ্যাঁকড়া,—সাজানো ওই লোভনীয় খাদ্যে আমরা ভাগ বসাতে পারবো না।

অন্যদিকে দেখুন আর এক কাণ্ড। এই লেখা ছাপবার সর্বময় কর্তা জাঁদরেল সম্পাদক মশায়ের ভ্রূ কী ভাবে কুঁচকে উঠেছে, দেখুন। সেই কবেকার পাঠক সম্বোধনের বঙ্কিমীয় রীতি, এই অত্যাধুনিক যুগে চলবে না! অডিটোরিয়ামের দর্শকদের মাঝখান থেকে কুশীলবদের মঞ্চে-ওঠা বা অভিনয়ের মাঝে মঞ্চ থেকে সরাসরি নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে বসা,—এটা 'আধুনিক' রীতি। অথচ কয়েকযুগ আগেও তো যাত্রাগানের পালা-য়, "বিবেক" মশাই এমন-টা করতেন! কবে সেই আদ্যিকালের 'কবি' মশায়রা নগরে-বন্দরে-গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে জনগণকে কবিতা

শোনাতেন। আধুনিক কালেও আমরা হর-হামেশা "পথ কবিসভা"য় জড়ো হচ্ছি। আসলে—সংযোগ। 'সহিত'-এর থেকে যদি সাহিত্য, নীরবে শুধু লেখার নয়, পাঠককে সোচ্চার ডেকে সঙ্গে নিলে পশ্চাদগামিতা হবে কেন? দোহাই সম্পাদক মশাই, ভ্রূ জোড়া নামান, সিরিয়াস পত্রিকায় অন্যরকম 'সোয়াদ' থাকলে ক্ষতি কী? সর্বময় কর্তৃত্ব আপনার, আপত্তি থাকলে প্যারা-টা কেটে দিলেই হয়। আমার থমকে থাকা গপ্পো-টার রস টঁকে যাচ্ছে যে!

পাঠকমশাই, আপনি আর আমি, হোস্ট-এর ডিশ দেখে, অমল, মিহিরের মতো হতবাক, বিমূঢ়। তাই না? তাহলে আসুন, ব্যাপার-টা গোড়া থেকেই দেখি আমরা।...

আগরতলা-র উত্তরে সিমনার মসৃণ পীচঢালা পথে, ভোরের বাতাস গা'য়ে মেখে ওরা দু'জন স্কুটারে চেপে চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা ধীরে সুস্থে পার হয়ে এসেছিলো। অমল আর মিহির। ঢেউ খেলানো চড়াই-উৎরাই, কখনো সমতল। দূরে, কখনো বা দুদিকে গ্রামের গা' ঘেঁষে অথবা দুদিকে লাল কাঁকুড়ে রুক্ষ টিলা পার হতে হতে শহরে ঘিঞ্জির কীট থেকে ওরা মুগ্ধ হয়ে, যখন চা-বাগানের বন্ধ দরোজায় থামলো, কব্জি ঘড়িতে তখন কাঁটায়-কাঁটায় আট। কিছুদূর পর পর দুটো দরোজা, দু'জোড়া দারোয়ানের জিজ্ঞাসাবাদ পার হয়ে ওরা বাগানের বাংলোর লনে এসে স্কুটার থেকে নেমেছিলো। ইউক্যালিপটাস গাছের সারির নিচে হিসেব মতো-ছাঁটা ঘাসের পরিচ্ছন্ন সবুজ লন। চারধারে মরশুমি ফুলের সমারোহ আর মন কেড়ে নিচ্ছিল হেথা হোথা দৃষ্টিনন্দন বোগেনভিলিয়ার রংয়ের বাহার। লাল-গোলাপী-বাদামী, অর্থাৎ লালের সূক্ষ্ম তারতম্য নিয়ে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল স্তবক. মৃদু বাতাসে মাথা ঝুঁকিয়ে ওদের স্বাগত জানাচ্ছিলো। এ এক অনন্য নিভৃত পরিবেশ, যা ওদের কাছে দুর্লভ।

বারান্দা থেকে নেমে এসে কেয়ারটেকার ওদের অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুললে, ওরা একটু ফ্যাকাসে হয়ে বাগানের ম্যানেজার মিঃ অজিত চৌধুরীর উদ্দেশে লেখা নির্মাল্য-র চিঠিটা হাতে তুলে দেয়। বেতের আরাম চেয়ারে ওদের বসিয়ে তিনি চলে যান। দুজনের মনে সংকোচের বাষ্প ঘনীভূত হতে থাকে আর লজ্জা যেন মিশে যায় বোগেনভিলিয়ার লালে। আসলে, বাগানের ম্যানেজার ওদের একদম অপরিচিত। কিন্তু ওদের জিগরি দোস্ত নির্মাল্য-র খুবই পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। নির্মাল্য, ম্যানেজারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই ক্লান্ত, যানবাহনের দাবড়ানিতে অতিষ্ঠ দিনলিপিতে ওরা যখন হাঁস-ফাঁস, নির্মাল্য-ই তুলেছিলো কথা-টা।

'চল, অন্তত একটা দিনের জন্য কোথাও গিয়ে নির্মল নিভৃতে শ্বাস নিয়ে আসি।'

'কোথায়, কোথায়?' ওরা দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিলো।

'চল, একটা টি-গার্ডেনে ঘুরে আসি। ম্যানেজার অজিত চৌধুরীর সঙ্গে আমার

দারুণ ভাব-সাব, দু'-দু'বার ওর ওখানে গিয়েছি। বয়সে কিছু সিনিয়র হলেও জমাটি দিলদরিয়া মানুষ। দারুন জায়গা, ওয়াণ্ডার ফুল প্লেস, স্বর্গোদ্যান।'

'এক নাগাড়ে তো মুখে খই ফুটোচ্ছিস—ওয়াণ্ডারফুল প্লেস,···স্বর্গোদ্যান··· মহা ভাব-সাব। কিন্তু আমাদের দুজনের সঙ্গে তো ভদ্রলোকের চাক্ষুস পরিচয়ই নেই রে হতভাগা।'

'কি যে বলিস্। আমরা গেলে লুফে নেবেন, দেখে নিস্। তবে ভদ্রলোক একজন খাদ্যরসিক, খাওয়াতেও দারুণ ভালোবাসেন। অ্যাায়সা খাওয়ান যে, বেশ কিছুক্ষণ পেট নিয়ে নড়াচড়া দায় হয়ে ওঠে।

অমল, মিহির নীরব থেকে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, ভাবে কিছু।

'এই তো সেদিন গিয়ে এলাম'—নির্মাল্য নীরবতা ছিন্ন করে,—'আপিশের একটা কাজে স্যার সিমুনা পাঠিয়েছিলেন। আমি সাত সকালেই বেরিয়ে, পথে অজিত-বাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে, আপিশ টাইমে সিমুনার কাজ সেরে চলে এলাম ও'র কথা রাখতে। ওখানে খাওয়া-দাওয়া, জাম্পেশ আড্ডা দিয়ে রাত্তিরে আগরতলা ফিরে এসেছি। আসলে, ঐ জায়গা-টা আমার দারুণ ভালো লাগে। নিভৃত, ঘন সবুজ মনকে স্নিগ্ধ করে দেয়।'

মিহির নিচু স্বরে দ্বিধা ঢালে, 'তা-হ-লে···'

'কচু পোড়া, তাহলে!' খেঁকিয়ে ওঠে নির্মাল্য, 'সারা-টা দিন হৈ-হুল্লোড় করে, রাত আট-টা নাগাদ ব্যাক টু দ্য আগরতলার খাঁচায়। রাজী?'

অমল, মিহির ওর সঙ্গে হাত মেলায়।

'ব্যস্, সেকেণ্ড স্যাটার-ডে ফিক্সড্। কাল শুক্র, পরশু শনি, হাতে থাকে এক। পরশু জাস্ট্ সাড়ে ছ'টায় স্টার্ট, ডোণ্ট নড়চড়।'

নির্মাল্য বাগানে অজিত চৌধুরীকেও ফোনে সব জানিয়ে দেয়।

কিন্তু শনিবার কাকভোরে, অমল-মিহিরের বাসায়, ভগ্নদূতের ভূমিকায় নির্মাল্য এসে হাজির। 'ভাই রে দুঃখিত, ভেরী স্যাড, এক্সট্রিমলি সরি।'

'কী হলো? হলো-টা কী?' অমল, মিহির আঁৎকে ওঠে।

'আর বলিস্নে'। স্যার খবর পাঠিয়েছেন, আজ সকাল ন'টায় ওর সঙ্গে মনুঘাট যেতে হবে। জরুরি টুর প্রোগ্রাম।' ভাঙ্গা গলায় কথা শেষ করে সে,—'পি. এ.-র এই এক জ্বালা রে ভাই, চাকরিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে'।'

মনের ছুটন্ত টগবগে ঘোড়া হঠাৎ মুখ থুবড়ে ধপাস। ওরা হতাশ বসে পড়ে। 'চল্ রে মিহির, ঘোড়াটাকে একদম মেরে না ফেলে বরং সিপাইজলা বা অন্য কোথাও ঘুরে আসি দুজনে।'

···পাঠক মশাই, আমার সমস্যাটা কি জটিল হয়ে উঠলো দেখেছেন? গপ্পোটার শুরুতে, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়-শেষ অংশে বেশ এগিয়েছিলাম কিন্তু দেখুন,

ব্যাপারটা কেমন 'দ' হয়ে গেল। আমরা দুজনেও অলক্ষ্যে থেকে ভ্যাজালে পড়লাম। আগে-পরের যোগসূত্রে এখন কী ভাবে মেলাই! দেখা যাক্! চলুন এগোই।...

'না, না। তোদের দুজনের তো যেতেই হবে। অজিতবাবুকে খবর দেয়া হয়ে গেছে, তিনি সব আয়োজন করে প্রতীক্ষায় থাকবেন। সিমুনার লাইন খারাপ আজ, ফোনেও যোগাযোগ করা গেল না। কেউ-ই না গেলে খুউব অশোভন, অভদ্রতা হবে। সেণ্টিমেণ্টাল ভদ্রলোক, দারুণ সক্ড্ হবেন। একটা স্কুটার নিয়ে তোরা দুজনে চলে যা। আমি ও'র কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি দিচ্ছি, আর তোরা যে আমার পরাণের বন্ধু সে পরিচয় তো দেয়াই আছে।' একনাগাড়ে কথা বলে নির্মাল্য হাঁপাতে লাগলো।

'নোঃ মিস্টার নির্মাল্য, আমরা যাচ্ছিনে। অপরিচিত...অনাহূত, না, কিছুতেই সম্ভব নয়।'

'দোহাই ভাই, তোদের পায়ে পড়ি, আমার এমন একটি মাইডিয়ার বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাসনে'। তোদের সঙ্গেও আমার তাহলে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আমার অবস্থা-টা বুঝে একটু কন্‌সিডার করতে পারিসনে!' ভাঙা গলায় প্রায় কেঁদে ফেলে নির্মাল্য, 'সেণ্টিমেণ্টাল মাইণ্ডকে আঘাত দিলে কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এটা একটু ভেবে দ্যাখ্ দয়া করে। আমার আর কিছু বলার নেই রে।'

দোলাচল মন নিয়ে ওরা শেষতক্ রাজী হয় এবং যথাসময়ে দুজনে রওনা হয়ে চল্লিশ কিলোমিটার পথ, দু'পাশের অন্তর পরিবেশ মনে-চোখে মেখে পেঁছোয় গিয়ে বাগানে।

...ছেঁড়া সুতোয় গিঁট্ লাগালাম পাঠকমশাই। এবার আগের জায়গায় ফিরে আসা যাক, আপনিও সঙ্গে আসুন...

কেয়ার-টেকারের হাতে চিঠি পেয়েই, বোগেনভিলিয়া ঝোপের ওপাশ থেকে ঋজুদেহী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন এবং পা'য়ে পা'য়ে দশাসই এক জাঁদরেল কুকুর। কাছে এসেই হাত বাড়িয়ে দ্যান। হাসিতে উজ্জ্বল মুখে ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন করেন।—'কেজো লোক নির্মাল্য-টা এলো না বুঝি! এক্ষুণি ওকে একটা ঘুসি লাগিয়ে দিতে হাত নিস্‌পিস্ করছে, যাক সেটা তোলা রইলো। তুমি অমল, আর মিহির তুমি। কী ঠিক বলেছি তো?'

'আজ্ঞে, একদম ঠিক। কী করে পারলেন?'

হোঃ হোঃ হোঃ ক'রে দিলদরিয়া হাসি হেসে ওঠেন ম্যানেজার সাহেব। ও'র কুকুরও লেজ নাড়িয়ে হেসে ওঠে, মনে হলো, ওদের।

'না হলে কি আর শুধু শুধু ম্যানেজার হয়েছি, তোমাদের বন্ধু হয়েছি হে।

কিন্তু মাইডিয়ার ফ্রেন্ডস্, আজ্ঞে-আপনি-টাপনি নয়। আমরা স্রেফ তুমি, অমল-মিহির-অজিত, ব্যস্। ঘরে বেসিনে মুখ-টুখ ধুয়ে এসো, অনেক দূর থেকে এসেছো। চা না কফি।'

'আপনার ইচ্ছা।'

'আবার আপনি! ফাইন হবে এরপর সাবধান করে দিচ্ছি। ব্রেকফাস্ট হাল্কা না ভারী। দুপুরে কিন্তু হেভী কিছু আইটেম তৈরী হচ্ছে। বেশ শব্দ করে চিবিয়ে চিবিয়ে রসিয়ে স্পেশ ক'রে খাওয়া হবে ··ব্রেক ফাস্ট হাল্কা ঠিক আছে।'

ব্রেক ফাস্ট খেতে-খেতে টুক্-টাক্ আলাপের মধ্যে ওদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন অজিতবাবু। সঙ্গ দিলেন, কিন্তু এক গ্লাস দুধ ছাড়া খেলেন না কিছুই, ওঁর ব্রেকফাস্ট সকাল সাত-টায় হয়ে গেছে, ব্যাচিলার ভদ্রলোকের, কাজের লোকের ওপর ভরসা। তা' ওর খেদমতে, জনা ছ'য়েক দেহাতী মানুষ এক পা'য়ে দাঁড়ানো সর্বক্ষণ এবং কুকুর বাণ্টু তো ছায়া সঙ্গী আছেই। টি-গার্ডেন ম্যানেজারির রাজকীয় সুখ। টেবিলে বসেই তিনি রাঁধুনিদের নির্দেশ দিচ্ছেন, পাঁঠা আর মোরগের মাংসের কী কী আইটেম, কীভাবে রাঁধতে হবে। শুনে-শুনে, অমল, মিহিরের নোলায় জল এসে যায়। ভদ্রলোক খাদ্যরসিক এবং বিশেষজ্ঞও, ওদের মনে হয়।

'বনমোরগ আজকাল তো আর পাওয়াই যায় না। ছুন্নু আর এলুয়া, বন ঢুঁড়ে লাকিলি ধরে এনেছে একটা। যা দুটো আইটেম বানাবে না! দেখবে কী ওয়াণ্ডার ফুল টেস্ট। আমার তো এক্ষুণি জিবে জল এসে যাচ্ছে। হতভাগা নির্মাল্য-টা এলো না বলে ক'যেও, দুঃখ হচ্ছে। যাক্‌গে।' দুধের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন,—'পাঁঠার মাংস দইয়ে ভেজানো রয়েছে, ওদের সঙ্গে আমি নিজেও হাতা ধরবো, তোমাদের অনারে অ্যায়সা দুটো আইটেম তৈরী করবো, শুধু এর জন্যেই তোমাদের বাগানে আসতে হবে বার বার। তোমরা সত্যিই লাকি, আমাদের দীঘি থেকে ঢাউস একটা রুই ধরা পড়েছে, মাথা-টা দিয়ে ঘি-চুড় ঘণ্ট আর ক'টা পেটি ভাজা। আচ্ছা, কালিয়া করা হবে, নাকি ওটা ডিনারের জন্য থাকবে, বলো তো?'

'ওটা রাতেই হবে বরং'—লাজুক গলায় ওরা উত্তর দেয়, 'আমরা একটু বাগান-টা ঘুরে দেখে আসি।'

'সিওর। অ্যাই ফাগুয়া, সাহেব লোগোকে গার্ডেন দেখ্‌লাও।'

বাগান-টা বেশ বড়ো। চারা তৈরীর নার্সারি থেকে শুরু করে ম্যাচুরড্ সারিবন্ধ চা-গাছের গা' ঘেঁষে ওরা ঘুরে বেড়ালো। মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতালি, উড়িয়া, ত্রিপুরী নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা দল বেঁধে পিঠের ঝাঁপিতে চা-পাতা তুলছে। কারখানা ঘরে নানা ভাবে চা-পাতার প্রসেসিং হচ্ছে। শ্রমিকদের বস্তিতে ওরা ঘুরে বেড়ালো। শিশু-কিশোরদের হাত থেকে তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ-এর খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ সেরে, বাংলোয় ফিরলো দুপুর একটায়।

অজিতবাবুর ধমক খেতে হলো। 'এতো দেরী! খেতে বসবো কখন? রাঁধুনিদের সঙ্গে নিজেও হাত লাগিয়েছি, যা' গন্ধ ছড়াচ্ছে না, কী বলবো—খিদে-টা দারুণ চাগিয়ে উঠেছে। আমার আর তর্ সইছে না হে।'

বার-চেম্বারের দরজা খোলেন তিনি, দামী হুইস্কি, রাম, বিয়ার কয়েক বোতল মজুত। 'দু' এক পেগ্ টেনে নাও, যেটা খুশি। খাবে না? এক'গ্লাস বিয়ার নাও তাহলে, খাওয়া-টা জমবে ভালো। অভ্যাস নেই!' অজিতবাবু দীর্ঘ'শ্বাস ফেলেন, 'একসময় আমিও রসিক ছিলাম, এখন আর খাইনে। ও'চা-ও'চা অনেক বন্ধু আসেন তো, তাই সব রকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট রাখতে হয়। ঠিক আছে, দুটো বাথ-রুম রয়েছে ঢুকে পড়ো দুজনে। আধ্-ঘণ্টার মধ্যে ডাইনিং-টেবলে হাজিরা চাই।'

এবং ডাইনিং-টেবলে ম্যানেজারের মুখোমুখি ওরা বসলো। মনের খুশি মুখে ছড়িয়ে অজিতবাবু বললেন,—'আজ অনেকদিন পর তোমাদের সুবাদে একটু ভালো-মন্দ খাবার, হাড় চিবিয়ে, রসিয়ে খাওয়া হবে। নাও হে অমল, মিহির, শুরু করে দাও।'

নিজেদের খাবারে হাত দিতে গিয়ে, ম্যানেজারের ডিশ্ দেখে ওরা চমকে ওঠে, হাত গুটিয়ে নেয়। অজিতবাবুর ডিশে কিছু গলানো ভাত, পেঁপে-কাঁচকলা-ঝিঙে সেদ্ধ আর বরফ কুঁচির ওপর রাখা একবাটি দুধ, ব্যাস। নিজেদের রাজকীয় খাবারের দিকে লজ্জায় সঙ্কোচে ওরা তাকাতে পারে না। বিপুল উৎসাহে হৈ-হুল্লোড় করে মাছ-মাংসের নানা রকম উপাদেয় খাদ্য তৈরী করালেন, এমনকি রান্নায় নিজেও হাত লাগালেন যিনি তার নিজের জন্য স্রেফ গলা-সেদ্ধভাত!

'আরে হলো-টা কী! খাচ্ছো না কেন?' অজিতবাবু হাঁক দিলেন। কয়েক-মুহূর্ত সময় পার করে বললেন, 'ওঃ, বুঝেছি।' খর্বদেহী ভদ্রলোক যেন কুঁকড়ে গেলেন। উচ্ছ্বল গলার স্বর বড়ো করুণ। 'মাস ছয়েক ধরে বাধ্য হয়ে এই ডায়েট নিতে হচ্ছে রে ভাই। ত্রিপুরা, কলকাতার অনেক বড়ো ডাক্তার দেখিয়েছি, প্যাথোলোজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু হয়েছে। ম্যালিনা-গলস্টোন-ডিওডোনাল-পেপ্‌টিক-গ্যাস্ট্রিক আলসার, হেন-তেন কতো কী নাকি স্থায়ী বাড়ি করে ফেলেছে আমার পেটে। সুতরাং এই চলছে···' দুটো ট্যাবলেট জল দিয়ে গিলে, আবার বললেন,—'খাওয়ায় একটু হেরফের হলেই বিপদ, দারুণ কষ্ট। তবে হ্যাঁ, পেট কাঁটা-ফাটায় আমি নেই বাপু। দেখা যাক জল কোথায় গড়ায়। মাংস-মাছ অর্থাৎ আমিষ খাদ্য ছোটো বেলা থেকেই আমার প্রিয়, ছ'মাস আগ পর্যন্ত প্রচুর খেতাম, শিকার তো ছিলোই! এবং মাথা ঘামিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতিতে রান্না হতো, খাদ্যরসিক ছিলাম।' চাপা দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে বলেন,—'[illegible] অভ্যেস তো, তাই সেদ্ধ-গলাভাত গলা দিয়ে নামতে চায় না, সুতরাং চোখের সামনে অন্য কেউ আমার প্রিয় আইটেমগুলো রসিয়ে রসিয়ে স-শব্দে চিবিয়ে

খেলে, সেই শব্দ-দৃশ্যে ঐ গলাভাত-কাঁচকলা সেখাই কিছুটা মুখরোচক হয়ে ওঠে। তাই শুরু করে দাও, তোমরা খেলে—আমার খাওয়া-টা সহজ হয়ে ওঠে।'

অগত্যা মিহির, অমল খেতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে অজিতবাবুও। 'ওহে, মুরগীর হাড়গুলো ঠেলে রেখো না, চিবিয়ে খেতে পারো-বনমোরগ ওটা। আমি তো ভাই মোরগ-পাঁঠা যাইহোক হাড় চিবিয়ে ছাতু না করে আরাম পাই না।'

ওয়েটারদের দেখিয়ে তিনি বলেন, 'ওদের এক-একজনকে কতোদিন বলেছি, খাবার টেবলে সঙ্গী হতে। না, সব অর্ডার ক্যারি করবে, শুধুমাত্র খাবার টেবলে সঙ্গী হওয়া ছাড়া। ওই দ্যাখো, আমার চেয়ারের পেছনে মাটিতে তাকাও, আজ তোমরা আছো, নয়তো টেবলে আমার মুখোমুখি 'ও' বসে এবং চোখ-টোখ বুজে সশব্দে হাড় ভেঙে ভেঙে ছাতু করে খায়।'

ওরা দুজন মেঝেতে তাকায়। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে লেপ্টে বসে চোখ বুজে সশব্দে হাড় চিবুচ্ছে বাণ্টু। মানে কুকুরটা।

'দেখেছো কেমন খাদ্যরসিক। বাণ্টুর জন্য রোজকার হাড় বরাদ্দ আছে, ওই আমার খাওয়ার টেবলে সঙ্গী হয় রোজ।' শান্তিপুরী-অজিতবাবু খুশিতে আঞ্চলিক ভাষায় বলেন,—'অহন খাওয়াটা বাক্কা সোয়াদ লাগতাছে···।

অদ্ভুত ব্যঞ্জনায় ওঁরা হেসে ওঠে এবং এতক্ষণে অমল, মিহির এবং অজিত বাবুও খাদ্যের স্বাদ পেতে শুরু করে।

ত্রিপুরায় বাংলা গল্পচর্চার পরিবেশ তৈরী করার ব্যাপারে শ্রীবিমল চৌধুরী একটি অনন্য ও প্রবীণতম নাম। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাত-অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাম্প্রতিক সাহিত্যের সবকিছু জেনে ফেলার দাবিদারদের কাছে তাঁর এই সাম্প্রতিকতম গল্পটি উপস্থিত করা হোলো।

—সম্পাদক, স্পন্দন

রাত কাঁচা হলেও এসব গা-গঞ্জে এখন মাঝরাত। চুপচাপ ঘরের বাইরে এলো নিতাই। ঘুম আসে না। লুঙ্গির ভাজে বালি শুকিয়েছে অনেকক্ষণ। হাঁটতে চলতে ঝুর ঝুর করছে।

বাইরে চাঁদ ঝকঝকে উঠোন। নিতাই উঠোনে নেমে আসে। চারপাশটা ভাল করে দেখে নেয়। তারপর কোমর থেকে লুঙ্গির ভাঁজটা খোলে। গোছা করে ডান হাতে লুঙ্গিটা ধরে বা-হাত ভাঁজের মধ্যে ঢোকায়।

আছে। বস্তুটার স্পর্শে গায়ে কাঁটা দেয় নিতাই-এর। আস্তে আস্তে হাতটা বের করে আনে। মুঠোর মধ্যে জিনিসটা সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে। অজ্ঞান্তেই ডান হাতের মুঠো আলগা হয়ে পড়ে। লুঙ্গিটা আলগোছ নেমে যায় গোড়ালি অব্দি।

মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছাকাছি তুলে একটু-একটু করে খোলে নিতাই। গলা শুকিয়ে কাঠ। মুঠোটা টানটান খুলে গেলে তার হাত কাঁপতে থাকে। চাঁদের আলোর সবটা নিমেষে তার হাতের তালুতে চলে আসে।

টাটানো সূর্যের আলোতে এক পলকে দেখার সময় যা ভেবেছিল—তাই। কাঁপা কাঁপা হাতের তালুতে চাঁদের রুপোলি জেল্লা এখন স্বর্ণাভ হয়েছে। কানপাশা। এখনো কিছু বালুকনা লেগে আছে।

চকিতে মুঠো বন্ধ করে নিতাই।

কখন বিছানায় শুয়েছে খেয়াল নেই। রাত কত, মালুম করতে পারে না নিতাই। চিৎ হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। দো-চালায় ছোট বড় অনেক ফাঁক ফোকর। চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে সেসব পথে।

ওপাশের মাচায় বউ ছেলে মেয়ের ঘন ঘন শ্বাসের শব্দ। নিতাই দুচোখ জুড়তে পারে না। নানা চিন্তার জট ঘিরে ধরেছে এখন তাকে। তিনঢেপার সবুজ রঙ তার দুচোখে ছেয়ে যায় রাতের অন্ধকারেও।

তিন ফসলা। কাজে আসতে-যেতে তিনঢেপার সামনে প্রতিদিনই একবার দাঁড়ায় নিতাই। প্রতিবারই লোভী হয়। একদিন রসরাজ বলেছে—'জলের দরে ছাইড়া দিব সাহাবাবু'।

লোভেই চমকে উঠেছিল নিতাই।

—সইত্য!

—শুনছি।

মুঠো-করা হাতটা বালিশের তলায় রেখে উপুর হয়ে শোয় নিতাই। এক জায়গায় রাখতে-রাখতে গরম হলে—বালিশের তলাটা বেশ ঠান্ডা মনে হয়। ভালো লাগে।

জেলেরা তো জলের থেকেই পায়। সেই মাছে জেলের হক। নিতাই তো জল থেকেই পেয়েছে। না চেয়েই পেয়েছে। জেলেরা আকাঙ্খা নিয়েই জাল ফেলে।

নিতাই তো কামনা করেনি কোনদিন। জলের দরে জমিটুকু কিন্যা লাইতে পারি না!

ভেবেই নিতাই নিশ্চয় করে—পারি। পারতাম না ক্যান্! জলের থিক্কা পাওয়া। মাছ না হইছে তো কী হইছে—জলের মইধ্যে তো আছিলো!

বালিশের তলা থেকে হাতটা বের করে নিতাই। বিছানায় উঠে বসে। মুঠোটা ওপর নিচ দোলায় ক'বার। ওজন বোঝার চেষ্টা করে।

একদিন দেখেছে। কালাচাদ বণিক এভাবেই মেপে বিধু সাহাকে বলেছিল—

'হাজার দেড়েক তো পড়বোই। বেশীও হইতে পারে। আটানার বেশী ছাড়া কম হইতো না।'

নিতাই গিয়েছিল ধার নিতে। দেখেছে। বিধু সাহারটাও কানপাশা ছিল। এটার মতোই হবে। এটা কি একটু বড়!

মুঠো খুলে চোখের সামনে আনে নিতাই। একটা অস্পষ্ট চকচকে আভা। ভাল দেখা যায় না। ঘরের ভিতর অন্ধকার যেন আরো ঘন এখন। হাতড়ে-হাতড়ে বালিশের পাশে রাখা দেশলাইটা পেয়ে যায়। চৌকি থেকে নিঃশব্দে নেমে দাঁড়ায়।

কুপিটা ঘরের কোণে থাকে। হামা দিয়ে আন্দাজে সে দিকে যায় নিতাই। হাতের ছোঁয়া লেগে অন্ধকারে কুপিটা উল্টে যেতে দ্রুত সোজা করে। থাপ্‌টি মেরে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। ওপাশে শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ এখন আরো ঘন।

ফস্ করে দেশলাই কাঠিটা জ্বলেই দু-হাতে আড়াল করে ধরে। একটা হাতের তালু মুঠো করে থাকার ফলে নিতাই বেশ কসরতে কাজটা করে। কাঠিটা ভাল করে জ্বলে উঠতে ধীরে ধীরে কুপিটা জ্বালায়। পেছন দিকটা চকিতে দেখে নেয় একবার। বাঁশের ঝাঁপ দরজাটাও।

খুব ধীরে মুঠো খুলে ধরে নিতাই চোখের সামনে। চোখ বুজে আসে তার। না, বিধু সাহারটার থিক্কা অ-নে-ক বড়!

নির্ঘাৎ বড়। ভাবে নিতাই। গোল মোটা। কারুকাজ করা। নিচের দিকে ফুলের মত একটা ঝুমকা। অপলক তাকিয়ে থাকে নিতাই। কুপির শিখা সোজা। কোন কম্পন নেই। দোলা নেই। নিতাই চেয়ে থাকে। তার চোখে মুখে হঠাৎ, হঠাৎই এক সুদূর আলো ছড়িয়ে পড়ে। মাঝরাতে সেই আলো কি তার ভিতরেও জাল ফেলে?

কালা বণিকের দোকানেই প্রথম ভেবেছে নিতাই কথাটা। ছোট্ট দুলজোড়ার ঘষামাজার কাজ শেষ করে সিন্দুকে তুলে রাখছিল কালা বণিক। হঠাৎ হাওয়ার মতোই বুকের ভিতর থলবল্ করে উঠে এসেছিল কথাটা।

—এইরম একজড়া দুল কত পড়ে, কালাদা!

খুবই বিনয় ঢেলে বলা। সিন্দুকের তালায় চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে একবার

অবাক চোখে নিতাইকে দেখেছিল কালা বণিক। পরমুহূর্তে তার ঠোঁট ভরা কৌতুক।

—ক্যান্‌! নিবি?

অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল নিতাই। অতশত ভেবে কি বলেছে?

—না না। মানে, এমনেই জিগাই আর কি!

—আটশ'।

কালাবাবুর কাছে হাউলাত ছিল তিনশ'। নিতাই সেদিন আরো টাকা পঞ্চাশেক চাইতেই গিয়েছিল। দাম শুনে ভেবেছে—কেরে যে জিগাইতি গেলি নিতাই! এর পরে নি টাকা মাগন যায়?

কিছুতে চাইতে পারেনি নিতাই।

ছোট ছেলেটার জন্যে। কদিন থেকে এক রা। 'ধলা ভাত খামু।' ভোলাবাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে গা-শুদ্ধু সবার নেমন্তন্ন ছিল। নিতাই সপরিবারে গিয়েছিল। ধবধবে শাদা ভাত। গরম গরম। সঙ্গে মুগডাল বাধাকপির ঘণ্ট মাছ। দই মিষ্টি তো ছিলই।

সেই থেকে ছেলের বায়না। সাদা ভাত খাবে। দু'দিন নিতাই মেরেছেও; মার খেয়ে চুপ মেরে গেছে। আবার একদিন ঘ্যান ঘ্যান।

কালা বণিকের কাছ থেকে ধার নিয়ে চড়িলাম বাজারে নাদিরশাইল কিনবে—মতলবটা এমন ছিল। কিন্তু দুলের দর করে চাওয়াই হয়নি আর।

ঘুমের মধ্যে বড় মেয়েটা বিড়বিড় করে ওঠে। নিতাই চট করে মুঠো বন্ধ করে ফেলে। ঘোর কেটে যেতে ফু করে কুপিটা নিভিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ একই ভবে অপেক্ষা করে। তারপর আবার হামা দিয়ে চৌকির দিকে এগোয়।

বিছানাটা বালিতে ভরে আছে। চিং হয়ে শুয়ে পড়ে নিতাই। মুঠোকরা হাতটা বুকের ওপর রাখে।

কানপাশাটা ভেঙ্গে গড়ালে এক জোড়া দুল হয়ে যাবে। শুধু যাবে কি, হয়ে-টয়ে কিছুটা থাকবেও। এতোবড় কানপাশা। বউকে দুলে কেমন দেখাবে!

বউটা সুন্দরী। হ্যাঁ, বেশ চাঁদ-চাঁদ ছিল। প্রথম রাতে চাঁদই তো ছিল এই ঘরে। তারপরও অনেক রাত। পাঁচ বছরে তিনটে—হতেই পারে। ঠিকঠাক খেতেও তো দিতে পারে না নিতাই।

এখনো, নিতাই ভাবে—এখনও একটু যত্ন লইলে আকাশ থিকা চাঁদডারে ঘরের ভিতরে আনন্‌ যায়। অন্ধকারে নিতাই ওপাশের মাচার দিকে তাকায়। আলাদা করে কিছু দেখা যায় না। শুধু শ্বাস-এর শব্দ।

এই ন'বছরে কিছুই তো চায়নি মানুষটা। আমিও তো কই, সোহাগ কইরা কই নাই—কী চাও কও দেখি বউ।

মুখ বুজে কবে লাউডগার কাছাকাছি চলে গিয়েছে—বুঝতে পারেনি নিতাই।

একটা অসহায় রাগ হঠাৎ টের পায় সে। হাতটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে উপুর হয়ে শোয়। কাল যা হবার হবে। ভেবে, ঘুমুতে চেষ্টা করে।

একটু তন্দ্রামতো এসেও ছিল। সহসা পাশের চালাঘর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দে চমকে ওঠে নিতাই। প্রাথমিক জড়তা কাটতে সামান্য সময়।

তারপরই ঝট্ করে বিছানায় উঠে বসে। কদিন থেকে চোরের উপদ্রব হচ্ছে খুব। কথাটা মনে হতেই আতঙ্কগ্রস্ত নিতাই দ্রুত ঘরের বাইরে। একচালায় ঢুকেই—না, আছে। বাছুরটাও।

একটা ত্রাস কেটে যেতেই মুহূর্তে আরেক ত্রাস ঘিরে ধরে নিতাইকে। কানপাশাটা বালিশের তলায় রয়ে গেছে। তন্দ্রার মধ্যে কখন মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ছুটে ঘরে ঢুকে সন্ত্রস্ত নিতাই বালিশের তলায় হাত ঢোকায়। যাবে কোথায়! কে নেবে। ওটা যে হক। জল থাইক্কা পাইছি। মা গঙ্গার দান।

ঘুম ততক্ষণে কেটে গেছে। রাত কি শেষ হয়ে আসে? হতে পারে। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে সিদ্ধান্ত হয় না।

ভোরবেলা দুধ দুইয়ে দিলে নিতাই যাবে ম্যানেজারবাবুর বাড়ি। দেড় সের রোজ। ব্যাংক থেকে লোন নেবার সময়ই ম্যানেজারবাবু বলেছেন—আমারে রোজ দিও নিতাই। কিস্তি জমা কইরা দিমু নে মাস মাস।

তাই তো! ছ-কিস্তি চালাবার পর আজ অব্দি ষোল কিস্তি খেলাপ। বাছুর বড় হলে দুধ কমে যায়। আর সংসার চলে কই! ছলছল চোখে ম্যানেজারবাবুর সামনে একবার দাঁড়ালে—'কি? এই মাসেও টাকা চাও, হাতে।'

মাস-মাস টাকা জমা পড়েনি তার। কানপাশাটা ছাড়াইলে লোন পরিস্কার হইতো না! লোন পরিষ্কার হলে গাইটা একেবারে নিজের হয়ে যাবে।

কিন্তু তা কি হবে। তিনঢেপার জমি, ধলা-ভাত, দুলে এসব?

ছটফট করে নিতাই। ভাবতে পারে না কী করবে। রাতে একা শুয়ে চিন্তা করলে এইই হয়। দিনের বেলায় কোন অসুবিধা নেই। রাইত যেন্ কাটে না। আকামের চিন্তা কিলবিল কইরা ধরে।

কানপাশাটা বিক্রি করে মণ-মণ নাদিরশাইল কিনে রাখা যায়। মেয়ে দুটো ছেঁড়া জামা ইজের প'রে স্কুলে যায়। ওদের নতুন কিনে দেয়া যায়। কন্যা সন্তান তো। কতদিক খেয়াল করতে হয়।

ব্যাঙ্কে টাকাটা জমিয়ে রাখলেও মন্দ হয় না। মাইয়া মানুষ বড় জল্দি বাড়ে। এই তো সেদিন ধীরু বললো—'ভাইরে, মাইয়াডা বড় হইয়া গ্যাল্। বউ-যে কানে কানে কইলো কাইল।' কবে যে নিতাই-এর কানে কানে ফিস্ফিস্ করে—ভাবতে পারেনা নিতাই।

সে আবার উপুর হয়ে বালিশের তলায় দুহাত ঢোকায়। মাথাটা ক'বার এপাশ ওপাশ করে। শেষে এক কাতে রেখে দীর্ঘ শ্বাস টানে। এবার ঘুমুতেই হবে।

ঘুমিয়ে পড়েই নিতাই জেগে ওঠে। বিছানায় উঠে বসে। বসতেই বড় মেয়েটা কাছে এসে বসে। এই সকালে স্নানও সেরে ফেলেছে। শাড়ী পরেছে। নতুন নতুন গন্ধটা নাকে ঝাপট্ মারে।

নিতাই অবাক হয় না। ভাবে, ওর বিয়ে দিতে হবে। আজ কথাটা পাড়বে বলিনের কাছে। বলিনের ছেলেটাকে তার খোব ভালা লাগে। কী একটা সরকারী কাজ করে। বলিন তো এখন আর জন খাটে না।

—দুল জুড়া তাইরে দিয়া দিমু।

বউ যে কখন এসে পাশে বসেছে টের পায়নি নিতাই। চমকে তাকিয়ে দেখে— দুই কানে দুল। ঝুমকা দুলছে। সারা শরীরে হঠাৎ বহু পুরনো ঝাঁঝালো ভালোলাগা পাক মারে। সামলে নিতে নিতে নিতাই দেখে বউটার গালে লাল লাজ।

—দুর পাগলি! তুমারটি দিবা ক্যান। তাইরে নতুন গড়াইয়া দিমু না। ব্যাংকের টাকা কার লাইগ্যা—

শেষ না শুনেই বউ উঠে চলে যায় চকিতে। মেয়ের সামনে বসতে পারছিল না বউটা। নিতাই জানে—ওটা বউ কথার কথা বলেছে। নিতাই ওই দুল জোড়া কিছুতেই দিতে দেবে না। সে কথা বউ কি কম জানে!

—বাবা, আমি জমিনে যাই। তুমার আইজ আইতে লাগবো না।

লেখাপড়ায়ও ভাল। ছেলেটা চাষবাস বুঝে নিয়েছে। আজকাল তিনঢেপার জমিটা ছেলেই চষছে।

—বাপধন, কী জালা করছো এই খন্দে?

—নাদিরশাইল।

ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সেদিকে চেয়ে থাকে নিতাই কিছুক্ষণ। বলিনের ছেলের মতো একটা চাকরী হয়ে যেতো! বিয়ে করাবে ছেলেকে।

নিতাই ভীষণ সুখী মুখে আলোর ফোয়ারা তুলে টান টান শুয়ে পড়ে বিছানায়। শুয়ে, ঝকমকে টিনের চালটার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে—নাদিরশাইল-নাদিরশাইল—

—কামে যাইতা না আইজ? বেইন্যা বেলার থিক্কা তো খালি নাদিরশাইল করতাছ। বুবায় ধরছে? না স্বপন দেখ!

আবছা কথা ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে কানে ঢোকে। এককাতে শুয়েছিল নিতাই। পিট-পিট করে চোখ খুলে সামনে ছড়িয়ে দেয়। আরে! ঠিকইতো। বেলা হইয়া গেছেগা।

ঝট্ করে উঠে বসে নিতাই।

—বাবা, আমার ধারাপাত—

কে? বড় মেয়ের গলা না। এই তো। কিন্তু ওর শাড়ী কই!

ওহোঃ! স্বপনই তো। নিতাই হেসে ফেলে। শেষরাইতের ঘুম তো। স্বপন-ভরা। আহারে যদি হইতো! কিন্তু কী দিয়ে হবে, কোত্থেকে হবে। জল কুপাইয়া?

চকিতে সব মনে পড়ে তার। হাতের মুঠোটা কোথায়? মুহূর্তে শরীরের সব অনুভূতি হাতে। যাবে কোথায়। ওটা যে হুক। ঝাটাঁত মুঠো করা হাতটা মুখের সামনে তুলে ধরে নিতাই।

সেই সঙ্গে অনেকগুলো ফাঁকা পাত্রের ডালা। অনেক কিছুই খুব দরকার। তিন ঢেপার জমি, ইজের-জামা, ধারাপাত, দুল, ভাত—খুব দরকার। সব হবে? স-ব!

উঠে বিমর্ষ মুখে ঘর থেকে বাইরে এসে উঠোনে নেমে দাঁড়ায় নিতাই। রোদের এখনই অনেক তেজ। কাজে যেতে হবে। আজ দুধ নিয়ে ছেলেটাই যাবে। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

কিন্তু ওটার কী করবে? কালা বণিকের কাছে যাওয়াটা—বিপদ। খুব বিপদ। নানা প্রশ্নের জবাবদিহি। চোর ঠাউরাতে কতক্ষণ। সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে নিতাই'র।

ভাবতে ভাবতে নিতাই মুঠো খোলে। রোদের মধ্যে হাতের তালু মেলে ধরে।

অবাক কান্ড। রোদে ধরে না কেন? ঝিকাইয়া উডে না ক্যান্! ঘামে?

দু'হাতের তালুতে খুব সন্তর্পণে ঘষে নিতাই। একবার লুঙ্গির খুট দিয়ে। তারপর নোখ দিয়ে মৃদু দু-একটা ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্।

চাড়ে যেমন উঠে আসে বালি। বেলচার মুখে। তেমনি একটা টুকরো। বাকলের মতো উঠে টুপ করে মাটিতে পড়ে।

উঠে আসা বাকলের জায়গায় লোহার রঙ সূর্য'ও ঢেকে দিতে পারে না। অত যে তেজ দেবদার: হেও পারে না!

কী থেকে যে কী হয়ে যায়।

নিতাই নদীর পাড় থেকে যখন নামছিল তখন সে খুব হালকা। পথে তিন ঢেপার পাশ দিয়ে আসার সময়ও বেশ ফুরফুরে ছিল। পথে যত কিছু পড়েছে সব কেমন আপন বলে মনে হয়েছে তার। মনে হয়েছে কাল থেকে এই অব্দি সে আপনদের ছেড়ে দূরে নির্বাসিত ছিল। সব চেনা মানুষদের সংগে অহেতুক বেশী-বেশী কথা বলেছে। তার মনে হয়েছে—বহুকাল পর। পাড় থেকে নামার সময় দেখেছে ভগবান দাস পাশুমুখে জলে দাঁড়িয়ে।

—কিরে, ভগবাইন্যা। বিড়ি খাইবি এশ্গা?

নিতাই সাধারণত কাউকে দেয় না। চাইলেও না। ভগবান একটু অবাকই হয়েছে।

—বেপার কি কওছে, নিতাইদা!

—আছে! কমুনে।

বেলচা হাতে ছপ্ ছপ্ শব্দে নিতাই জলে নামে। তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে

দাঁড়ায়। খর চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ঝিলমিল জল বালির বুক ধুয়ে ধুয়ে আগের মতো।

নিতাই লুঙ্গির ভাঁজ থেকে কানপাশাটা হাতে নেয়। দেখে একবার। তার দুচোখে স্বজনবিয়োগের ব্যথা উপচে নদীর বুকে কাঁচা সূর্যের আলোর রহস্যময় দ্যুতির খেলা। চোখের তারায় অচেনা সেই আলো নিয়ে কানপাশাটার সোনা অঙ্গের খোঁদলটার দিকে চেয়ে থাকে নিতাই।

তারপর হঠাৎ ঝুঁকে জলের মধ্যে খাবলো মারে। বালির আস্তরণ ভেদ করে খানিকটা গিয়ে থামে তার মুঠো।

—কী রে নিতাই, মাছ ?

ধীরে ধীরে মুঠো খুলে দেয় নিতাই। জল থেকে টুক্ করে হাত তুলে নেয়। কানপাশাটা এখন আর তার হাতে নেই।

—না না, ভাণ্ডির বাস্কড়া—

কিন্তু বুকের ভিতর শুকনো একটা ঢেপা কখন যে ঢুকে পড়েছে, বুঝতে পারেনি নিতাই। যেমন বুঝতে পারেনি—কী গেল কী থাকলো।

অনেক চেষ্টায় একটা দেশজ গানের কলি মনে করে গুণগুণ করে ওঠে সে। বেলচাটা ভীষণ ভারী মনে হয় এখন। প্রাণপণে তবু বেলচা ওঠায়। খেপ মারতে গিয়ে চোখ আটকায় একটু দূরে।

খড়ের বেনাটা আংশিক ভেসে আছে।

মুহূর্তে বুকের ভিতর শুকনো ঢেপায় ছল-ছল কল-কল। বেলচাটা উঁচিয়ে ধরেই হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে নিতাই। হাসতে থাকে। মাঝে মাঝে হাসির ফাঁক ফোকড়ে বিড়বিড় করে -মাগো, বাচাইছো মা···বাচাইছো···মা···'

হতচকিত সঙ্গীরা কাজ বন্ধ করে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে।

—কি রে নিতাই, কি হইলো !

কে যেন প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারে পাড় থেকে। হাসতে হাসতে ঢোক গিলে কেশে-টেশে নিতাই তখন চোখের কোণে সূর্য ধরে ফেলেছে।

—হইছে। এস্পা বেপার—কমুনে—

দেবব্রত দেব আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'মুখ' নামক গদ্যপত্রিকার সম্পাদক ও নিজে একজন সৃষ্টিশীল গল্পকার।

ত্রিপুরার আদিবাসী-ভাষার লিখিত রূপ সম্পর্কে

ককবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ ও লিপি বিতর্ক

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী

ত্রিপুরার ৮টি তিব্বত-বর্মীয় উপজাতি-গোষ্ঠী দ্বারা কথিত ভাষাকেফলিত ভাষা-বিজ্ঞানের আলোকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরের সংগে সংগে বহু আকাঙ্খিত সুনির্দিষ্ট বানান পদ্ধতির অভাব দূরীভূত হলো। কোন অ-লিখিত ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া শুধুমাত্র ভাষাবিদদের দ্বারা সম্ভবপর হয় না, যদি না এর পিছনে বুদ্ধিজীবী, সমাজ-চিন্তানায়কদের একটি সুসংহত প্রচেষ্টা নিরলস ভাসে সহমর্মিতার সংগে কাজ করে! ককবরক ভাষার লিখিতরূপ ভাষাবিজ্ঞানী ডাঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় কখনই দিতে পারতেন না যদি না শ্রীযুত মোহন চৌধুরী, বীরচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ'-এর উদ্যোক্তারা তাঁদের সংগে যোগাযোগ করে ককবরকের উপভাষাগুলোর গবেষণার জন্যে সুপরিকল্পিত সুযোগ সুবিধা করে দিতেন। তাই, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই কাজ যাঁরা করলেন এবং যাঁরা করালেন, তাঁরা সমান ভাবেই ককবরক ভাষাভাষীদের কাছে অভিনন্দন যোগ্য।

বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া

ককবরক ভাষার লিখিতরূপ আবিষ্কারের শুভলগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহলে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে ভালো ও মন্দ দু'দিকই আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বুদ্ধিজীবীরা এই মর্মে বর্তমান কাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে, লিখিত ভাষায় মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ৮টি উপজাতির পারস্পারিক ঐক্য ও সংহতি দ্রুত গড়ে উঠবে এবং বয়স্কদের সাক্ষরতা ও শিশুশিক্ষাসহ উপজাতিদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির রাস্তা প্রশস্ত হবে। রাজ্যাভ্যন্তরের বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা ককবরক ভাষার লিখিত-রূপের মধ্য দিয়ে উপজাতি-বাঙালী মৈত্রী'র শক্ত বুনিয়াদ দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়েছেন। যে শিক্ষিত উপজাতিরা একটি সুনির্দিষ্ট লিখন ও বানান পদ্ধতির অভাবে তাঁদের মাতৃভাষায় মধ্য দিয়ে সাহিত্যকর্ম ও ভাবপ্রকাশের অন্যান্যস্তরে উত্তীর্ণ হতে বাধা পাচ্ছিলেন, তাঁরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার অন্যদিকও চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। এই গোষ্ঠীর শিক্ষিত উপজাতির কেউ ডাঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়কৃত বইটিকে 'একটি মাকালফল' বলে অভিহিত করেছেন, আবার কেউ বইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দল ও মতের অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন, কেউ আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে 'মা'র থেকে মাসীর দরদ' এমন রহস্যও করতে পিছপা হননি। জনৈক সমালোচক তো ঠোঁটকাটা ভাবে বলেই ফেলেছেন, "বাংলা লিপিতে ককবরক সাহিত্য প্রতিষ্ঠা

করা শব্দ অসম্ভব নয়, একেবারে অবাস্তব।" কাজেই কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের পরে এমন সব সমালোচনা বা ঘটনা ঘটছে, যার যথাযথ উত্তর না দিলে লিখিত কগবরকের যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ হতে বাধ্য।

বাংলা ও রোমান লিপির মধ্যে দ্বন্দ্ব

লিপি নির্বাচনের পূর্বশর্ত সংশ্লিষ্ট ভাষার আভ্যন্তরীণ রূপের আধুনিক ফলিত ভাষা বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণকে সম্যক গুরুত্ব না দিয়ে, রোমান না বাঙলা লিপি কগবরকের লিখিত রূপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, এই নিয়ে এক অবাঞ্ছনীয় মসী যুদ্ধ, বাক্ যুদ্ধ প্রকট হয়ে উঠেছে। এটা বলা যেতে পারে, সেই কথায় বলে, ঘোড়া আগে না চাবুক আগে, হাতি আগে না হাওদা আগে। ভাষা বিজ্ঞানীদের কাছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট ভাষার আন্তর বিশ্লেষণই মুখ্য—লিপি নির্বাচন গৌণ। এ ক্ষেত্রে প্রথমটির সংগে দ্বিতীয়টির বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, ভাষার গঠন প্রকৃতি জানবার ক্ষেত্রে যে সব ভাষাতাত্ত্বিক অস্ত্র (ধ্বনিগত, রূপগোত্রগত ও বাক্যবিন্যাসগত —Phonological, morphological ও syntactical) ভাষাবিজ্ঞানী প্রয়োগ করে ভাষার ধ্বনিগোত্র (Phoneme)-গুলির সংখ্যা ও বানান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—সে ক্ষেত্রে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। ধ্বনি গোত্রগুলি ও বানান পদ্ধতি আবিষ্কারের পর ভাষাবিজ্ঞানীকে যে কোনো লিপির কথা ভাবতে হয়। কারণ, প্রতিটি ধ্বনিগোত্র (Phoneme) এক-একটি প্রতীক গোত্র (Grapheme) দ্বারা জীবন্ত বা চলমান হয়ে ওঠে। আর, লিপি হলো ভাষার আভ্যন্তরীন চাহিদা অনুসারে কতকগুলো প্রতীক গোত্রের সমষ্টি। কিন্তু কোন ভাষার লিপি নির্বাচন করা ভাষাবিজ্ঞানীর একার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না; কারণ, **লিপি নির্বাচনের সংগে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে।** কোন ভাষা কোন লিপি গ্রহণ করলে তার সমস্ত দিককার অগ্রগমন গতিশীল হয়ে ঐ ভাষাভাষী জনগণকে সভ্যতার উন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে সহায়ক হবে, তার জন্য লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানী (linguist) ছাড়াও উপরোক্ত বিষয়ে পারঙ্গম ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। যে সব দেশে অ-লিখিত ভাষার লেখ্য রূপ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এরূপ কমিটি আছে। এ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ: During the first years after the Revolution, a new Alphabet Central Committee was organised under the Ministry for National Affairs. At that time many of the languages had as yet been inadequated studied; many difficulties were encountered in elaborating new alphabets and many mistakes made."—উদাহরণটি প্রণিধানযোগ্য।

অবশ্য একথা ঠিক,—"যে কোনো ভাষাই যে কোনো বর্ণমালা দিয়ে লেখা যায়,

শুধু একটি ধ্বনিগোত্রের জন্যে একটি প্রতীক গোত্রের ব্যবহার নির্দিষ্ট রাখা চাই ; প্রয়োজন হলে নতুন বর্ণমালা তৈরী করা যেতে পারে, কিংবা কোনো প্রচলিত বর্ণমালাকে কিছুটা সংশোধিত আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে।"—শুধু ভাষাবিজ্ঞানী সুহাস চট্টোপাধ্যায়ই নয়—সমস্ত ফলিত ভাষাবিজ্ঞানীই এই মতে বিশ্বাসী।

কগবরকের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত ২৭টি ধ্বনি গোত্রের জন্যে প্রয়োজন ২৭টি প্রতীক গোত্র ; আর তা যে কোনো বর্ণমালা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর যদি দু'একটি বিশেষ ধ্বনি গোত্র তার বিশেষ ধ্বনিমূল্যের জন্যে ঐ বর্ণমালায় না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো বর্ণমালা থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা কগবরকের ২৭টি ধ্বনিগোত্রের জন্যে বাঙলা বর্ণমালা থেকে ২৬টি এবং দেবনাগরী থেকে ১টি প্রতীকগোত্র গ্রহণ করেছি। এবং এইভাবে কগবরকের লেখ্যরূপ দিয়ে তার সহায়তায় বানান পদ্ধতি ঠিক করেছি। বাঙলা লিপি ছাড়া সংশোধিত আকারে রোমান লিপি বা যে কোনো পরিচিত লিপি দিয়েও আমরা একাজ সমাধা করতে পারতাম, তত্ত্বগত ভাবে কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু বাদ সাধলো কগবরকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ইতিহাসগত পরিবেশ। এই পরিবেশগুলোই সঠিকভাবে বলে দিলো কগবরক বাঙলা লিপি নিয়েই তার অ-লিখিত ইতিহাসের অন্ধকার থেকে লিখিত ইতিহাসের সূর্যালোকে প্রবেশ করবে। সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানী বেরেজিন (Berezin)-এর কথায়: It is no exaggeration to say that on the day when a people learned to write and to preserve written documents it passed out of pre-history and embarked upon a new course of development।" কগবরকভাষী ৮টি উপজাতি সম্প্রদায় তাঁদের উপভাষাগুলোর লিখিতরূপের উত্তরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের জাতিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। আমাদের সব কাজই পণ্ডশ্রম! একদল তথাকথিত ভাষা-বিজ্ঞানের দাবিদাররা বলছেন, বাঙলা লিপি দিয়ে কগবরকের লিখিতরূপ দেওয়ায় লিখিত কগবরকের যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে গেছে ; তার পায়ে নাকি বাঙলা বানান পদ্ধতির 'হসন্ত' (্) ও বিভিন্ন 'ফলা'র বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুহাস চট্টোপাধ্যায়-কৃত ও আমার পূর্ণ সহযোগিতায় লিখিত 'ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' বইটি একটু ভালো করে দেখলেই দেখা যাবে কগবরকের বানান পদ্ধতিতে সর্বত্র বাঙলা বানান পদ্ধতির 'হসন্ত' ও 'ফলা'র দাওয়াই এতটুকু দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে কগবরক ভাষীদের উচ্চারণে 'ফলা' ধরা পড়ে না। লেখায়, কি বাঙলা কি রোমানে, যে 'ফলা' এঁরা লেখেন, তা বাঙলা বানানের হুবহু অনুকরণ। উদাহরণ, <kulai> 'পড়ে যাওয়া' এঁরা বাঙলা বানান পদ্ধতিতে লেখেন <ক্লাই> ; বাঙলার ক্লান্ত, ম্লান প্রভৃতি বানানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। রোমানে লেখেন

<klai> ইংরেজীর 'flight', 'slight' প্রভৃতি বানান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অথচ উভয় ক্ষেত্রেই ভুল। <kulai> ককবরকের এই শব্দটির মধ্যে <k>র পরে একটি মধ্যস্থ উ (central u) থাকে। প্রচলিত এই উভয় বানানে এই ধ্বনিগোত্রটিকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হচ্ছে। অথচ উচ্চারণে এটি বিদ্যমান। আমরা ককবরকের বানান পদ্ধতিতে এটি <কুলাই> এভাবে লিখে মধ্যস্থ <উ> এই ধ্বনিগোত্রটির যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

এ'রা বলছেন: (ক) "কোনক্রমেই ঐ (বাঙলা) লিপিকে কক্—বরক লেখার উপযোগী করা যায় না। ঐ লিপিতে ত্রিপুরী ভাষার ধ্বনি যথাযথভাবে পরিস্ফুট না হওয়ায় ঐ ভাষা লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর ও দুর্বোধ্য বোধে পুস্তক প্রণয়ন ও চিঠি-পত্র লেখায় ক্ষান্ত থাকে।"

আমাদের বক্তব্য: আমাদের আবিষ্কৃত ককবরকের ২৭টি ধ্বনিগোত্রের মধ্যে ২৬টি বাঙলা বর্ণমালা থেকে ও ১টি দেবনাগরী থেকে নিয়ে ককবরক বর্ণমালা লিপিবদ্ধ করে তার ধ্বনি যথাযথ ভাবে 'পরিস্ফুট' করে প্রমাণ করেছি ঐ ভাষা লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর ও দুর্বোধ্য নয়। পঠন-পাঠন কালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এটি অনুধাবন করবেন।

এ'দের কথা: (খ) "বাংলা লিপি অক্ষরাত্মক (syllabic) বর্ণ, তাই উহা কক্-বরক-এর অনুপযোগী।"

আমাদের বক্তব্য: বাঙলা লিপি নির্ভেজাল অক্ষরাত্মক নয়। এটি বলা হলে বাঙলা লিপির চরিত্র শোধন করা হয়। বাঙলা লিপি কতকটা ধ্বনিমূলক, কতকটা অক্ষরমূলক। এসম্পর্কে প্রখ্যাত ভাষাবিধ ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর বিখ্যাত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' বইয়ে লিখেছেন: "ভারতীয় লিপি কতকটা ধ্বনিমূলক এবং কতকটা অক্ষরমূলক। যেমন, 'অ' ধ্বনিমূলক হরফ, কিন্তু 'ক' (—ক্অ) অক্ষরমূলক।" আর, বাঙলা লিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তিত রূপ। কাজেই এইসব ভাষাবিজ্ঞানের দাবিদাররা একটু সচেতন ও সত্যভাষী হলে শোভন হয়। আসলে, কোনো দেশে নির্ভেজাল অক্ষরমূলক লিপি (syllabic script) পাওয়া সত্যিই কঠিন। এই প্রসঙ্গে H. A. Gleason, Jr, তাঁর 'An Introduction to Descriptive linguistics, বইয়ে লিখেছেন,—True syllabic writing systems are not common. A few ancient, and mostly poorly understood systems are thought to have been syllabic." সে যা হোক, ধ্বনিমূলক (Alphabetic) লিপিতেই হোক, আর অক্ষরমূলক (syllabic) লিপিতেই হোক, এদের গঠন প্রকৃতি নিয়ে যত মতপার্থক্য থাকুক না কেন, কোনো ভাষায় লিখিতরূপ দেওয়ায় ক্ষেত্রে এসব বিতর্ক আনা মানে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া এবং তা একান্তই অবৈজ্ঞানিক।

এ'দের কথা: (গ) "বাঙলা লিপি অক্ষরাত্মক বর্ণ;......অক্ষরাত্মক বর্ণে 'অ'

ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে সর্বদা লাগিয়া থাকে। এই 'অ' ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে কিছুতেই দূরীভূত হয় না।"

আমাদের বক্তব্য : কগবরকে বিবৃত অক্ষর (Open syllable) ও সংবৃত অক্ষর (Closed syllable) উভয়ই আছে। এবং উভয় ক্ষেত্রে 'অ'-এর ব্যবহার কিরূপ হবে, তা কগবরকের বানান পদ্ধতি আলোচনা কালে আমরা সহজ ভাবে দেখিয়েছি। পঠন-পাঠন কালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যে এ ব্যাপারে হোঁচট খাবেন না—একথা আমরা হলপ করে বলতে পারি। এক্ষেত্রে অধ্যাপক খোদ সুহাস চট্টোপাধ্যায় 'কগবরক বানান পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ সূত্র' প্রসঙ্গে লিখছেন, "কগবরকে অ-এর ব্যবহারে আমরা কিছু পরিবর্তন আনছি, বর্জন করছি <ː> এর ব্যবহার। এই দুইটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সুতরাং এদের বিষয়ে এক সংগে আলোচনা করা অসংগত হবে না।" উৎসুক পাঠক একবার ডকটর চট্টোপাধ্যায়ের এই অধ্যায়টি পড়লে মোটেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন না।

এঁরা আরও বলছেন : (ঘ) "একই ভৌগলিক সীমায় একই লিপিতে দুই ভাষা লিপিবদ্ধ করিলে দুর্বল ভাষার শব্দ সরিয়া যাইতে বাধ্য।"

আমাদের বক্তব্য : কিন্তু, একই লিপিতে একাধিক ভাষা লিপিবদ্ধ করবার নজির আমাদের কাছে আছে। উদাহরণ, সুইজারল্যাণ্ডে একই রোমান লিপিতে তিনটি ভাষা, যথাক্রমে ফরাসী, ইতালিয় ও জার্মান লেখা হয়ে থাকে। এই ভাষাত্রয়ী পরস্পরের সংগে শব্দ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কেউ দুর্বল হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে পরস্পর পরস্পরের শব্দ ঋণ হিসেবে নিয়ে লাভবান হয়েছে, এটিই ভাষাবিজ্ঞান সম্মত কথা। এঁদের কথা যদি সত্যি হিসেবে ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে রোমান লিপিতে কগবরক লিপিবদ্ধ করলে ঐ একই সমস্যা দেখা দেবে। কারণ, ত্রিপুরায় একই ভৌগলিক পরিসরে বাঙলা ও কগবরকের ন্যায় ইংরেজীও অন্যতম লিখিত ভাষা।

এঁদের শেষ কথা হলো : (ঙ) "বাংলা লিপিতে কক্‌বরক সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে, বাস্তব ব্যবহারে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।" —এই কথার সরলার্থ এই যে দীর্ঘদিন ধরে বাঁঙলা বর্ণমালার সংগে কগবরক ভাষীদের পরিচিতি সত্বেও এবং স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টার দ্বারাও কগবরকের মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।"

আমাদের বক্তব্য : সাহিত্যসৃষ্টি কি শুধুমাত্র লিপির উপর নির্ভরশীল? লিপির সংগে পরিচয় থাকলেই কী সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে? বাঙলা লিপির সংগে কগবরক ভাষীদের পরিচয় থাকা সত্বেও কেন এই লিপির মাধ্যমে কগবরক সাহিত্য জন্ম নেয়নি, তার বাস্তবসম্মত কারণগুলো নিম্নরূপ :—

(১) কগবরকের কোনো লিখিতরূপ ছিলো না,

(২) বাঙলা হরফের মাধ্যমেও কগবরকের একটি সুনির্দিষ্ট বানান পদ্ধতি চালু হয়নি ;

(৩) শিক্ষার মাধ্যমরূপে রাজারা কগবরক চালু করেন নি ;

(৪) কোনো ভাষায় সাহিত্যকর্ম হতে পারেনা যদি না তার পেছনে কড় দরের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে ;

(৫) সাহিত্যের বাহন পত্রপত্রিকা ছিলো না।

কাজেই, গোড়ায় গলদ থাকলে বাঙলা লিপির ওপর দোষ দিয়ে আর কী হবে ?

তা সত্ত্বেও, বাঙলা লিপির হুবহু অনুকরণ করেই রাধামোহন ঠাকুর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কগবরকের মাধ্যমে অজস্র লেখা কগবরকভাষী বুদ্ধিজীবীরা লিখেছেন যা অমুদ্রিত অবস্থায় পাহাড় কন্দরের ঘরে ঘরে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। কবিতা-নাটক-গান-উপন্যাস সুপরিকল্পিত ভাবে সংগ্রহ করলে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীতে স্থান পেলে গুণগতভাবে এগুলোর উৎরে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। আজও ইস্কুল ও কলেজের কগবরকভাষী ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ভাবে খাতায় বাঙলা লিপির মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। এঁদের কাছে রোমান লিপি কল্পনা জগতের বস্তু—কলমের মুখে যা আসে তা একান্ত বাস্তবভাবে বাঙলা হরফ !

রোমান লিপির প্রবক্তারা এইভাবে বাঙলা লিপির ওপর উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আঘাত হেনে এটাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে রোমান লিপি কগবরকের পক্ষে শুধু উপযোগী নয়, একমাত্র সম্বল। কাজে-কাজেই রোমান লিপির বাড়াবাড়ির সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

লিপি নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কগবরকের একটি লিখিতরূপ দিতে পেরে আমরা একটি জাতীয় কর্তব্য সমাধা করেছি বলে মনে করি। আমরা এটাও আশা করেছিলাম যে কগবরক তার লেখ্যরূপ পরিগ্রহ করবার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু হবার সুযোগ পাবে এবং সরকার এবিষয়ে তৎপর হবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কগবরকভাষী কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি কগবরকের বাঙলা লিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন। কগবরক রোমান লিপি গ্রহণ করুক ; এটিই এঁদের চূড়ান্ত অভিমত। রোমান লিপি ধ্বনিমূলক। এর সাহায্যে রাতারাতি বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কগবরককে অল্পদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেয়া যায় বলে এরা ভাবেন।—এবং 'এই অজুহাতে সাহিত্য সূচনার মুহূর্ত আরও সুদূর ভবিষ্যতে পিছাইয়া যাইতে পারে। এই একই কারণে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলন কাজও পিছাইয়া যাইতে পারে।"—কগবরকভাষী শিক্ষিত একাংশের এই ভাবাবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত এঁদের কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে ? কিন্তু সুখের কথা, কগবরকভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁদের পরিচিত বাঙলা হরফ রাখতেই চান।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিশেষ-লিপি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা শোভন নয় এবং তা প্রগতির পরিপন্থী। আমি এখন শুধু এটুকুই ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণ করতে চাইছি যে কোনো ভাষায় বিশেষ লিপি নির্বাচনের পেছনে শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্বই কাজ করেনা, তার পরিপাশ্বর্স্থ ভিন্ন ভাষাভাষী জনজীবনের সামাজিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক নানা রকমের প্রক্রিয়া কাজ করে। আর এগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী জনগণ জ্ঞাতসারে আর অজ্ঞাতসারে কোনো লিপি নিতে পারে না।

লিপির ইতিহাসে দেখা যায় আধুনিক সভ্য জগতের লিপিমালা (১) মিশরীয় লিপিচিত্র, (২) ভারতীয় লিপিচিত্র (৩) চৈনিক লিপিচিত্র থেকে বিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের একটি উদ্ধৃতি—'মিশরীয় লিপিচিত্র হইতে পরবর্তী কালের ইউরোপীয় বর্ণমালাগুলি এবং আরামীয়—হিব্রু—আরবী প্রভৃতি বর্ণমালাগুলি উৎপন্ন। মিশরীয় লিপিচিত্রের আদিমরূপ (Hieroglyphic) হইতে সংক্ষিপ্ত বা শিষ্ট (Hieratic) লিপি আসিল। এই সংক্ষিপ্ত শিষ্ট মিশরীয় লিপিকে নিজেদের ভাষার উপযোগী পরিবর্তন দিয়া গ্রহণ করিল সেকালের বাণিজ্যপরায়ণ ফিনিসীয়রা। এই ফিনিসীয় লিপি হইতে একদিকে গ্রীক ও তাহা হইতে রোমান প্রভৃতি ইউরোপীয়, এবং অপর দিকে আরামীয়—হিব্রু—আরবী প্রভৃতি সেমীয় বর্ণমালা উৎপন্ন" —আমার বক্তব্য বিষয় বোঝাতে সহায়ক হবে।

এর মধ্যে একটি অতি মূল্যবান কথা আছে যে 'বাণিজ্যপরায়ণ ফিনীসীয়রা শিষ্ট মিশরীয় লিপিকে কিছু পরিবর্তন করে নিজেদের ভাষার উপযোগী করে নিয়েছিলো।' অর্থাৎ ফিনিসীয়রা বাণিজ্যর পদেশে মিশরীয় জনসাধারণও তাদের লিপির সংস্পর্শে এসেছিলো। ফিনিসীয়দের নিশ্চিত কোনো লিপি ছিলো না। তারা নতুন কোনো লিপি উদ্ভাবনের কথাও ভাবেননি। অথবা চৈনিক লিপিচিত্র ও ভারতীয় লিপিচিত্রের কাছেও ধর্ণা দেননি। তাঁরা তাদের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্যে পরিচিত শিষ্ট মিশরীয় লিপি নিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা মিশরীয়দের সঙ্গে তাঁদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন সম্ভবপর হয়েছিলো। এইভাবে গ্রীকরা কোনো সময়ে ফিনিসীয়দের সংস্পর্শে এসেছিলেন; আবার রোমানরা (রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা) গ্রীকদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন ঐ একইভাবে। কাজেই লিপির ইতিহাস মানেই ধারের ইতিহাস। এবং এই সাংস্কৃতিক ধার (cultural borrowing) লিপির আদিম জন্মলগ্নে বাস্তব-সম্মত হয়েছিলো এবং এখনো হচ্ছে।

'লিপির জন্যে লিপি'র কথা যারা বলেন, অথবা শুধুমাত্র সহজ করে লেখার জন্যে বিশেষ লিপি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, তারা ভুলে যান যে লিপির সঙ্গে জটিল সামাজিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। আবার এই সামাজিক সম্পর্ক বাণিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সোভিয়েত ভাষাবিদ বেরেজিন তাঁর, 'Lectures on Linguistics' গ্রন্থে লিপির জন্মকথা বলতে গিয়ে বলছেন, 'The origin of writing arose

partly through trade among early peoples by means of rough and conventional pictures of commercial objects, which shows a complicated level of social relations at that time, and partly through the necessity to record some-thing for a long period of time." একথার মধ্য দিয়ে লিপির অর্থনীতি-নির্ভর বাস্তব প্রয়োজনের কথা ধরা পড়ে।

আমাদের ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি কিভাবে পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। তিব্বতী বর্মী-সিয়ামী-যবদ্বীপী এবং কোরীয় বর্ণমালাগুলো ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ায় চৈনিক তুর্কীস্থানের বালুকাস্তূপের মধ্য থেকে তুখারীয় ভাষার যে প্রস্তরলেখগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে তা সবই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী বা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সওদাগররা তাঁদের সওদা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করতেন। এইসব সওদাগররা তাঁদের পণ্যদ্রব্য ও তা ক্রয়বিক্রয়ের হিসাবপত্র তাঁদের নিজস্ব লিপি (ব্রাহ্মীলিপি) দিয়ে লিখে রাখতেন। পূর্ব ও মধ্য এশীয় যেসব দেশে তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন সেইসব দেশের জনসাধারণ তখনো লিপির ব্যবহার জানতেন না। খুব সম্ভবতঃ তারা ভারতীয় সওদাগরদের মারফত তাদের প্রয়োজনের তাগিদে ব্রাহ্মী লিপি গ্রহণ করেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, আর্থনীতিক সম্পর্ক ছাড়া একজাতির সঙ্গে অন্য জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ইতিহাসগত কোন সম্পর্কই ঠিকমতো গড়ে ওঠে না।

এবার উদুর্কে আরেকটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদুর্ ভারতীয় আর্যভাষা সম্ভূত হয়েও কেন গতানুগতিক ভাবে ভারতীয় নিজস্ব ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত কোনো লিপি গ্রহণ না করে বিদেশী সেমীয় আরবী তথা ফারসী লিপি (Perso-Arabic Script) গ্রহণ করলো, তার মূলেও কিন্তু ঐ একই সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ইতিহাসগত প্রক্রিয়া কাজ করছে। আবার, খুব মজার কথা এই যে হিন্দী ও উদুর্ প্রায় একই ভাষা। "এই হিন্দী ও উদুর্র একত্রে নামকরণ হইয়াছে 'হিন্দুস্থানী' (বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা) বা 'হিন্দুস্থানী' (বা আরবী অক্ষরে লিখিত উদুর্ভাষা)।" এদুটির মধ্যে লিপিগত পার্থক্য ছাড়া যে শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান তাহলো, উদুর্ তার সাহিত্যিক ভাষায় হরদম ফারসী, আরবী, তুর্কী শব্দ গ্রহণ করেছে; আর, অন্যদিকে হিন্দী তার সাহিত্যিক ভাষায় সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটিয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের কথায়, "Hindi and Urdu as said before, are two styles of the same language."

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, কোন কারণে একই ভাষা নাগরী ও আরবী এই দুটি পৃথক লিপি গ্রহণ করলো এবং তার পেছনে কোন বাস্তব প্রক্রিয়া কাজ করছে, এই তথ্য খুঁজে বের করা।

একথা মনে করে এগুনো যাক যে উদুর্ ভাষায় আরবী লিপি অভারতীয়। এখন

এই অভারতীয় আরবী লিপি ভারতের একটি ভাষার দ্বিতীয় লিপি রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে হয় হিন্দিভাষী জনগণ দায়ী, নতুবা বিদেশীরা একাজ করেছেন। বস্তুত, ভারতের মুসলমান আগমনের মধ্যে আরবী লিপি ও উর্দু ভাষার জন্ম কথা নিহিত রয়েছে। খলিফা উমর ফারুক (৬৩৪-৬৪৪ খৃষ্টাব্দ)-এর রাজত্বকাল থেকে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সূচনা হয়। এবং ৭০৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের সিন্ধুদেশ অধিকারের মধ্য দিয়ে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। সেখান থেকে শুরু করে মহম্মদ বিন্-তুঘলক (১৩২৫—১৩৫১)-এর রাজত্ব কাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মানেই সমগ্র উত্তর দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমভারতে ইসলামীয় ভাষা, (আরবী) ইসলামীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু আরবদেশীয় সিন্ধুবিজয়ী মুসলমানগণ ভারতে আরবী ভাষা, আরবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে (তামাম হিন্দুস্থানের ভাষা) হিন্দীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, আরবী ভাষা যেমন মিশরীয় ও ইরানীয় ভাষাকে সহজেই গ্রাস করতে পেরেছিলো, তেমনি ভাবে হিন্দীও আরবীর দ্বারা অল্প দিনের মধ্যে উদরসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, কি আরবী কি ফারসী দিয়েও হিন্দীর গতিশীলতা রোধ করা গেল না। এই অভিজ্ঞতার পর থেকে মুসলমানগণ হিন্দী বলতে ও শিখতে শুরু করলেন। না করেও কোনো উপায় ছিলো না। কারণ কথ্য হিন্দীই ছিলো সমগ্র ভারতের বৃহদংশের বাণিজ্যিক ভাষা। কিন্তু তাঁদের কথিত হিন্দীর মধ্যে মুসলমানগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষার আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে হিন্দী ভাষাকে ইসলাম প্রভাবান্বিত উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করলেন। হিন্দী ছাড়া যখন রাজ্যাভ্যন্তরে কি গণসংযোগ কি বাণিজ্যিক যোগাযোগ কিছুই করা সম্ভব নয়—একথা ভেবে মুসলমানগণ কত দ্রুত এবং কিভাবে হিন্দী আয়ত্ব করা যায় তার কথাই ভাবতে থাকেন। হিন্দী শিখতে গিয়ে তাঁরা যে প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হলেন তা হলো হরফ সমস্যা। দেবনাগরী হরফ ছিলো তাঁদের অপরিচিত। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত হরফ আয়ত্ব করা সত্যিই কঠিন ছিলো। কাজেই তাঁরা ভাবলেন, হিন্দীকে যদি তাঁদের নিজস্ব লিপিতে লিপান্তর (transliteration) করে নিতে পারেন তাহলে হিন্দী শেখা তাঁদের পক্ষে সহজতর হবে। তখনই তাঁরা নিজ লিপি আরবী দিয়ে হিন্দী লিখতে শুরু করলেন। এবং খুব সম্ভবতঃ এভাবেই আরবী লিপিতে উর্দু (ইসলামীয় হিন্দী) লেখার প্রচলন হলো।

হিন্দীর আরবী লিপি গ্রহণের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক তথা ধর্মীয় প্রক্রিয়া কাজ করেছিলো বলে মনে করি। ভারতে মুসলমানরা অনুপ্রবেশ করে হিন্দুদের অপ্রীতি-ভাজন হলেন, তখন থেকেই হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিকে এই দুটি ভিন্ন ধর্মীয় জনগণ একে অন্যের থেকে কোনো সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বিনিময় করতে সম্মত ছিলেন না। অথচ হিন্দী ভাষা শেখা ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু হিন্দুদের 'দেবনাগরী'

লিপি গ্রহণ করতে তাঁদের ধর্মীয় মন সায় দেয়নি। আবার মুসলমানরা দেবনাগরীর মাধ্যমে হিন্দী শিখুক, একথা হিন্দুরা কখনোই ভাবতে পারতেন না। তাঁদের সবসময় ভয় ছিলো 'ম্লেচ্ছরা' দেবনাগরী লিপি আয়ত্ব করে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ করে ফেললে তা পতিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত পড়তে প্রবেশাধিকার পাননি—একথা আমরা জানি। কাজেই কোন ভাষা কোন লিপি গ্রহণ করবে তা শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনার একচেটিয়া ব্যাপার নয়, ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক (Religio-Psychological) প্রক্রিয়াকেও অস্বীকার করা যায় না।

এবার ভারতের বাইরের দিকের অভিজ্ঞতার দিকে তাকানো যাক। প্রথমে আমরা সোভিয়েত অভিজ্ঞতার শরণাপন্ন হই। এখানে দেখতে পাবো, প্রাক্-বিপ্লবের যুগে জারের রাশিয়ায় অধিকাংশ ভাষাই লিখিত রূপ পায়নি। সোভিয়েত 'ইউনিয়নে' বর্তমানে ১২০টি ভাষা আছে। জারের রাশিয়ায় গুটিকতক বৃহৎ ভাষা ছাড়া অন্যসব ভাষার কোনো লিপি ছিলো না। বিপ্লবের পরে জাতিগত সমতা আনবার জন্যে অলিখিত ভাষাগুলির লিখিতরূপ দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে এই জন্যে New Alphabet Central Committee নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। তিরিশের দশকের মধ্যে এই কমিটি ভাষাবিদ, জাতীয় বুদ্ধিজীবী, ও গণসংগঠনগুলোর সাহায্যে লাতিন লিপি (Roman Alphabet)-কে অনুসরণ করে অলিখিত ভাষাগুলোর লিখিত রূপ দেওবার কাজ সমাপ্ত করেন। কিন্তু ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে ভাষার উন্নয়ন বিষয়ক সারা রুশ অধিবেশনে লাতিন লিপির পরিবর্তে রুশলিপি (Cyrillic Alphabet)-র মাধ্যমে লিখিতরূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, রুশ ভাষার সংগে সম্পর্কযুক্ত ঐ অ-লিখিত ভাষাগুলোর লাতিন লিপির সঙ্গে সংযোগ বা সম্পর্ক কমই ছিলো। কিন্তু একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে লাতিন লিপিতে কোনো ভাষা লেখা হোতো না। এস্তোনিয়ান, লিথুয়ানিয়ান, লাটভিয়ান এবং ফিনিশ ভাষা-গুলো লাতিন লিপিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, বাস্তব অবস্থা সম্যক-বিশ্লেষিত হয়ে কোন ভাষা কোন লিপি নেবে, তা যথার্থভাবে নির্ধারিত হয়েছে।...

ভাষাগুলোর চাহিদা অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩ প্রকার লিপি প্রচলিত আছে। ১) আর্মেনীয়-জর্জীয় ভাষায় প্রাচীন লিপি, ২) এস্তোনীয়, লিথুয়েনীয়, লাটভিয়ান ও ফিনিশ ভাষায় লাতিন লিপি, ৩) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের স্লাভিক শাখার ভাষাগুলি ও অন্যান্য ভাষার জন্যে রুশ লিপি (Cyrillic Alphabet)। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে রুশ লিপিও গ্রীক লিপির এক বিশেষ রূপ থেকে উদ্ভূত। সিরিল ও মেথোডিয়াস নামে দুজন ধর্মযাজক গ্রীক লিপিকে সংশোধিত আকারে স্লাভ ভাষাগুলোর জন্যে রূপ দেন। কিন্তু, স্লাভ ভাষাগুলোর এমন কতকগুলো ধ্বনিগোত্র ছিলো, যার প্রতীকগোত্র গ্রীক লিপিতে

ছিলো না। তখন এই যাজকদ্বয় হিব্রু লিপি থেকে একটি অথবা দুটি প্রতীক গোত্র (grapheme) আমদানি করেন এবং আরো কয়েকটি নিজেরা আবিষ্কার করেন। এইভাবেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রুশ লিপি রূপ নেয়। ধর্মযাজক সিরিলের নামে এই লিপির নাম হয়েছে সিরিলীয় লিপি (Cyrillic Alphabet)।

এইসব থেকে এই প্রতীতি জন্মে যে ভাষায় লেখ্যরূপের জগতে মূল তিনটি লিপিবংশ থেকে সব ভাষায় লিপি উদ্ভূত হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ইতিহাসগত দিকের প্রতি সম্যক নজর দিয়ে এক একটি অ-লিখিত ভাষার জনগোষ্ঠী কিছু সংশোধিত আকারে অপরের লিপি গ্রহণ করেছেন।

এখন রোমান লিপির কথা ভাবা যাক। রোমান লিপিও গ্রীক লিপি থেকে উদ্ভূত। বেরেজিনের কথায় "The Greek alphabet, for instance, gave rise to the Etruscan, which in turn gave rise to the Roman."

ইউরোপে -- ১) লাতিন থেকে উদ্ভূত আধুনিক রোমান ভাষাগুলো (যেমন ইতালীয়, ফরাসী প্রভৃতি) ২) পশ্চিম জার্মানির উপশাখার ভাষা ইংরেজী, জার্মান ও ওলন্দাজ, ৩) পূর্ব ইউরোপের পোলিশ, চেক, স্লোভাক, ক্রোট, স্লোভিন প্রভৃতি ভাষা রোমান লিপি গ্রহণ করেছে। ইউরোপের অন্য কোনো ভাষা রোমান লিপি নিয়েছে কিনা লেখকের জানা নেই। এইসব ভাষার রোমান লিপি নেয়ার পেছনে ঐসব পূর্বোক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ইতিহাসগত প্রক্রিয়াগুলো নিশ্চিত ভাবে কাজ করেছে। ইউরোপে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা কেনা জানে? ব্রিটেনে প্রথমে কেলটিক শাখার ভাষা প্রচলিত ছিলো। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে জার্মানিক জাতির অন্তর্ভুক্ত আঙ্গল, স্যাকসন ও য়ুট উপজাতিরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এইসব উপজাতির কথ্য জার্মানিক ভাষা থেকে ইংরেজীর উদ্ভব। এই ইংরেজী ভাষা ব্রিটেনে কথিত কেলটিক শাখার ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। রোমান লিপিও এইভাবে ব্রিটেনে চালু হয়।

এইভাবে, লিপি নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখলাম যে, লিপি নির্বাচন শুধুমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিবেচনার একমাত্র নিয়ামক ব্যাপার নয়; সামাজিক (পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জাতিগুলোর সংগে তার সম্পর্ক), অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ইতিহাসগত দিকগুলোকে উপেক্ষা ক'রে অতীতে কোনো অ-লিখিত ভাষার জনগণ কোনো লিপি নির্বাচন করতে পারেন নি। এখন তা করা হলে সংশ্লিষ্ট ভাষা কানাগলির অন্ধকারে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে তার গতিবেগ হারাবে। কগবরকের পক্ষেও এই একই সত্য প্রযোজ্য।

কগবরকের ওপর জোর করে বাঙলা লিপি বা রোমান লিপি বা অন্য যে কোনো লিপি চাপিয়ে দেয়া মারাত্মক ভুল হবে যদি আমরা লিপি নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিস্মৃত হই। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ (Indologist) ডায়াকভ তাঁর 'The National problems in India' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সব অ-লিখিত ভাষার লিখিত রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে যে বাস্তবসম্মত মন্তব্য করেছেন তা এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য:

"An Indian or Latin alphabet can be adopted when evolving a script for the peoples who have not yet acquired one. At present it is difficult to say which of them will be chosen but a script has to be provided for these languages is quite certain."

কগরবকভাষী শিক্ষিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলছেন, রোমান লিপি ছাড়া কগবরকের সাহিত্য সাধনা হতে পারে না। তাঁদের কাছে প্রশ্ন, কগবরকের দূরাত্মীয়া তিব্বতি-বার্মী ও মণিপুরী রোমান লিপি না নিয়ে কী সাহিত্য সৃষ্টি করছে না? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা চীনী (কগবরকের মাতামহী) চিত্র-ভাষ লিপি (Picto-ideogram)-র ন্যায় জটিল লিপি নিয়ে কী সাহিত্য বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন নি। চীনীয় (চৈনিক) লিপি দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে জাপানী লেখক কী নোবেল পুরস্কার পান নি? রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রভৃতিকে কী সাহিত্য সৃষ্টি করতে রোমান লিপির শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো? সুতরাং কগবরকের ক্ষেত্রে রোমান লিপি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অন্য উদ্দেশ্যসাধিত হতে পারে, কিন্তু কগবরকের কোনো লাভ হবে না।

পরিশেষে একটি অশোভন উক্তির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ত্রিপুরার খ্রীষ্টীয় মিশনারীর ভূতপূর্ব প্রধান Mr. Brian K. Smith ত্রিপুরার খ্রীষ্টান মিশনারীর Director of Evangelism-কে লিখেছেন: Although Dr. Suhas Chartterjee's work is in Bengali script, he has on two occasions told me privately that Roman script is much better for writing 'Kok Borok'. Pressures other than linguistic and scientific consideraiions have led him to adopt Bengali script." মোদ্দা কথা, ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার বিবেচনা অগ্রাহ্য করে বিশেষ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ডক্টর সুহাস চ্যাটার্জী বাঙলা লিপি দিয়ে কগবরকের লেখ্যরূপ দিয়েছেন। কথাটি সত্য হলে, এরূপ দাঁড়ায় যে, 'প্রেসার' ই ডক্টর চ্যাটার্জীকে কগবরকের জন্যে রোমান লিপি নিতে দেয়নি। মিস্টার স্মিথকে গোপনে ডক্টর চ্যাটার্জী কি বলেছিলেন তা আমি জানিনে; কিন্তু, এটি জানি যে, কগবরক গবেষণার দুবছরের মধ্যে ডক্টর চ্যাটার্জী তাঁর ছাত্রদের সহায়তায় কগবরকের ২৭টি ধ্বনিগোত্র আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তারপরে লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে করবরক ভাষীদের সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পর্ক কীভাবে গত পাঁচ শ' বছর ধরে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সংগে সহ-অবস্থান ও আদান প্রদান করেছে তা বিশ্লেষণের জন্যে এবং এবিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্যে তাঁকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিবেচনা তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন, কিন্তু ঐ একটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে কোনো ভাষার লিপি নির্বাচন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কাজেই একান্ত অন্যায় ভাবে

ডক্টর চ্যাটার্জীর ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর চরিত্র হনন করা খুবই দুঃখজনক।...

গত ১৯৭৩ সালের ৭-৯ই অক্টোবর কক্-বরক্ সাহিত্য সভার আমতলী সম্মেলনে এই গোষ্ঠী রোমান লিপি নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন নি। আসাম থেকে 'বড়ো' সাহিত্যসভার কিছু প্রতিনিধি তাঁদের রোমান লিপির অভিজ্ঞতা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সম্মেলনের প্রতিনিধিরা কগবরকের লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যান। প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রোমান লিপিকে সমর্থন করেন নি। কাজেই ঐ সম্মেলন কগবরকের লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হয়ে রোমান লিপির প্রবক্তাদের বিফল মনোরথ করে দেয়। আমরা এই প্রবক্তাদের আলেয়ার পেছনে না ছুটে বাস্তবসম্মতভাবে লিপি নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মেনে নিতে আবেদন জানাচ্ছি। এঁরা যেন ভেবে দেখেন, ইতিমধ্যে তাঁরা তুচ্ছ লিপির প্রশ্নে মারাত্মকভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাটি চালু করা। এ ক্ষেত্রে অনৈক্য মানেই সর্বনাশ।

সবশেষে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে একটি বিতর্কের জবাব দিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ কোরছি। উপজাতিদের কথিত ভাষাটি <কগবরক> না <কক্-বরক> নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট ভাষাটির উপজাতিরা জানেন যে <কক> অর্থ 'ভাষা' আর <বরক> এর অবিকল অর্থ যদিও 'মানুষ' তথাপি এক্ষেত্রে শব্দটার প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'স্বজাতি' বা 'আমাদের'। তাহলে কগবরকের অর্থ হচ্ছে 'স্বজাতির' বা 'আমাদের' ভাষা এঁরা যখন শব্দটি উচ্চারণ করেন তখন <কগবরক> উচ্চারণ করেন—<কক-ববক> নয়। এর পেছনে একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া কাজ করছে। সেটা হলো দুটি সঘোষধ্বনি গোত্র (voiced phoneme) ও অঘোষধ্বনি গোত্র (unvoiced phoneme) পরস্পর সহাবস্থান করলে সঘোষধ্বনি গোত্রে রূপান্তরিত হয়। এখানে <বরক> এর <ব> সঘোষধ্বনি গোত্র; আর পূর্ববর্তী <কক> এর <ক> অঘোষধ্বনি গোত্র। একসঙ্গে উচ্চারণের সময় সঘোষ <ব> অঘোষ <ক> কে ক-বর্গের সঘোষ <গ>-এ রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ পরবর্তী <ব> এর প্রভাবে <ক> <গ> হয়ে গেছে। কগবরকে <ক> এবং <প> এমনই দুটি ধ্বনি গোত্র (phoneme) যারা পরবর্তী সঘোষধ্বনি গোত্রের প্রভাবে তাদের অঘোষ চরিত্র হারিয়ে যথাক্রমে সঘোষ <গ< এবং <ব> হয়ে যায়। ধ্বনিবিজ্ঞানে একে বলা হয় সমীভবন (assimilation)। বর্তমান ক্ষেত্রে পরাগত সমীভবন (regrcssive assimilation) প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে। কাজেই <কক-বরক> না লিখে <কগবরক> লেখাই ভাষা বিজ্ঞান-সম্মত। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন <কক-বরক>-এরপ্রচলিত <—> হাইফেনটি আমরা তুলে দিয়েছি। একটি ভাষায় নামের মাঝখানে একটি হাইফেন রাখলে

বিসদৃশ দেখায়। বাঙলা বা English-কে যদি আমরা <বাঙ-লা> <Eng-lish> এই ভাবে লিখি তাহলে বিশ্রী দেখায়। এই কারণে দুটি শব্দের মাঝখানের হ্যাইফেনটি আমরা তুলে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে কোরেছি।*

---

* প্রথম প্রকাশ: 'সমাচার', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, আগরতলা।

টীকা: ত্রিপুরার অন্যতম সরকারী ভাষা। 'কগবরক' ত্রিপুরার আদিবাসী (উপজাতি) মানুষের প্রধানতম মৌখিক ভাষা লিখিতরূপে। এই ভাষার লিপি সম্পর্কে এখনও কিছু বিতর্ক রয়েছে। প্রায় বিশবছর আগেকার এই লেখাটি তাই এখানে পুনর্মুদ্রিত হোলো। গত দুই দশকের এই লিপি বিতর্কের সারমর্মটি আমরা পরের কোনো সংখ্যায় উপস্থিত করবো। এইসঙ্গে নিচে যুক্ত করে দেয়া হোলো লেখকের সাম্প্রতিক সংযোজন। —সম্পাদক, স্পন্দন॥

কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ ও লিপি বিতর্ক: সংযোজন

কগবরক লিপি বিতর্কের হালফিল অবস্থা:

বর্তমান নিবন্ধের উপরোক্ত অংশ যখন পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, তখন পার্বতী ত্রিপুরার গোমতী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, আর লিপি বিতর্কের শেষ এখনো হয়নি। কগবরকের জন্যে বাংলা লিপি না রোমান লিপি—যুযুধান এই বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কগবরকের একটি নিজস্ব লিপির দাবী। উপজাতীয় ভাষার লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন বিতর্ক সত্যিই নজীর বিহীন। কগবরকের লিপি বিতর্ক সাঁওতালী ভাষার লিপি বিতর্ককেও হার মানিয়েছে। পাঠকবর্গকে এই চলমান বিতর্কের হালফিল চালচিত্র বোঝানোর জন্যে বর্তমান নিবন্ধের সঙ্গে একটি সংযোজন জুড়ে দিচ্ছি। লিপি বিতর্কের এই সংযোজন অনেকটা গঙ্গা পুজোর মতন। কগবরক লিপি বিতর্কে অংশ নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন এবং সংবাদপত্রে এ বিষয়ে যেসব সংবাদ ও মন্তব্য পরিবেষিত হয়েছে, তারই সার সংকলন এই সংযোজন।

কগবরকের নিজস্ব লিপি:

কগবরকের বাংলা, রোমান লিপির সতিনী দ্বন্দ্বে যোগ দিয়েছে এই ভাষার নিজস্ব লিপির দাবী। এই দাবীর তাত্ত্বিক জনক হচ্ছেন ত্রিপুরার রঘুনাথ মুর্মু শ্রী অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা। শ্রী ত্রিপুরা ত্রিপুরার উপজাতীয় জাতীয়তাবাদী অন্দোলনের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতি—এই উপজাতীয় রাজনৈতিক

দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের তাত্ত্বিক ভাষ্যকারও তিনি। তিনি একাধারে পুরোহিত কাপালিক ও লেখক। কগবরকের সাংস্কৃতিক জগতে যাতে অ-কগবরক সাংস্কৃতির প্রভাব পড়তে না পারে তার জন্যে তিনি একজন কতর্ব্য প্রহরী। কগবরকের লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি না বাংলা না রোমান অবস্থানে থেকে কগবরকের জন্যে একটি নতুন লিপি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত এই লিপি উপজাতীয় সমাজে সাদরে গৃহীত না হওয়ায় তিনি পরে কগবরকের জন্যে রোমান লিপির সুপারিস করেন ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির সাংস্কৃতিক সংগঠনের তাত্ত্বিক পুরোধা হিসেবে। কিন্তু শ্রী ত্রিপুরা আবিষ্কৃত কগবরকের এই নিজস্ব লিপি বাংলা, রোমান দ্বন্দ্বের মাঝখানে আবার উঁকি মারতে শুরু করেছে। কাজেই, দেখাযাক, এই নতুন লিপি কেমন। শ্রী ত্রিপুরা তাঁর প্রণীত। কক্‌বরক লিপি সমস্যার মত ও পথ' পুস্তিকায় 'নিজস্ব লিপি' সম্পর্কে লিখেছেন- -''ভাষা সৃষ্টি হওয়ার সব ভাষার ভাবগুলি ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যক্তিরা মনে করিতেন যে লিপি সৃষ্টির কার্য্য ঈশ্বর বা কোন দেবতা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মী লিপিকে ব্রহ্মার সৃষ্টি মনে করিতেন কিন্তু ভাষা বিদদের মতে এই মত অন্ধ বিশ্বাস মাত্র।

সম্প্রতি পণ্ডিত রঘুনাথজী মুর্মুর সাঁওতাল লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ লিপি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লেপচাদেরও নিজস্ব লিপি আছে তাহা আবিষ্কার করেন সিকিমের রাজা ছা দোর নাম গ্যাল ষোড়শ শতাব্দীতে। কারণ যে কোন ভাষার নিজস্ব লিপি না থাকিলে ভাষার প্রচলিত শব্দের ধ্বনি সমূহ ভাষার রীতি প্রকৃতি সম্যকরূপে অন্য কোন লিপিতে পরিস্ফুট করা সম্ভব নহে।

আমিও সুদীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় কক্‌ বরক লিখিবার সম্পূর্ণ উপযোগী কক্‌বরক বর্ণমালা উদ্ভাবন করিয়াছি। কক্‌বরক বর্ণমালা নাই এই কথা এখন আর বলা যায় না। ইহার গতি অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে। প্রয়োজনে কক্‌বরক ভাষী জনগণ এই বর্ণমালা কোন সময়ে ব্যবহার করিবেন। এই বর্ণমালা সমষ্ঠিতে ২৬ ছাব্বিশটি। ১৬ ষোলটি ব্যঞ্জন বর্ণ। তিনটি অযোগ বাহু বর্ণ। ছয়টি মৌলিক স্বরবর্ণ ও একটি যৌগিক বর্ণ। স্বরবর্ণ মোট সাতটি।

উচ্চারণ নিম্নরূপ ঃ—

১) ব্যঞ্জন বর্ণ ঃ—কা, গাম, মাই, চা, জাভ্রা, আঞা, তা, দা, নাই, পার, বাই, রা, লা, ওয়া, শা, হা।

২) অযোগবাহ বর্ণ ঃ— তুংকলক, মোক, ফতা।

৩) স্বরবর্ণ মোট সাতটি যথা ঃ—অ, আ, ই, উ, এ, আ, আই।

এই কক্ বরক বর্ণমালার ছাপায় ব্যবস্থা না থাকায় বাস্তব ব্যবহারে ব্যয়সাপেক্ষ। তবে প্রত্যেক কক্ বরক ভাষীর এই নিজস্ব লিপিকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা ও শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে দিন দিন পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও বড়ো, মেচ, কুচ, খাকিয়া, গাড়ো প্রভৃতি জনগণের নিকট ইহা ছড়াইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া মুরুং, খুমি, বাছারী ও অন্যান্যদের নিকট ইহা আদরণীয় হইবে, তখন আমরা কয়েক লক্ষ লোক মিলিতভাবে এই বর্ণমালাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব। বর্তমানে ইহার গতি অতীব ধীর ও মন্থর হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং নিজস্ব লিপি প্রচলনের প্রস্তুতিকালে দ্রুত ভাষা উন্নয়নের পক্ষে একমাত্র বর্ণাত্মক বর্ণ রোমান লিপিই কক্‌বরক লিপির যথাযোগ্য স্থান অধিকার করার যোগ্য। বর্তমানে আসামে ও অন্যান্য স্থানে প্রায় সকল (Trible Language) ট্রাইবেল ভাষা রোমান লিপিতে লিখিত হইতেছে।"

শ্রী অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরার নিজস্ব লিপির সমর্থনে কয়েকজন উপজাতীয় বুদ্ধিজীবীও কলম ধরেছেন। এ সম্পর্কে অজিতেশ দেববর্মা ১৯৯০-এর ৮ই নভেম্বর 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলবরক ভাষার জন্য নতুন লিপি চালু হোক' নিবন্ধে বলেছেন, "···ককবরক লিপি নিয়ে এ ধরণের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাই বিকল্প একটি উপায় আমরা যদি গ্রহণ করি, তাতে প্রথমাবস্থায় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হলেও বর্তমান লেখকের ধারণা লিপি নিয়ে এই যে দীর্ঘকালীন বির্তক চলছে তার চির অবসান ঘটবে। এই বিকল্প উপায়টি হচ্ছে—নতুন ককবরক লিপি প্রবর্তন করা। এ ব্যাপারে আমরা একদা শ্রীযুক্ত অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা কর্তৃক সৃষ্ট 'ককবরক লিপিমালা' কে প্রয়োজনীয় সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কথা ভাবতে পারি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনুরূপ ব্যবস্থা সাঁওতালী ভাষার ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছিলো। প্রথম দিকে এই ভাষা লিপি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে রোমান, দেবনাগরী ও বাংলা লিপি গ্রহণ করা নিয়ে এক দীর্ঘকালীন বিরোধ দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু বিশিষ্ট সাঁওতালী পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু কর্তৃক উদ্ভাবিত 'অলচিকি' নামের নতুন এক সাঁওতালী লিপিমালা প্রচলনের ফলে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ককবরক ভাষার ক্ষেত্রেও ককবরকের নিজস্ব কোন লিপিমালা প্রবর্তিত হলেই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে।"

কগবরক ভাষা-ভাষী আরেকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক শ্রী নরেশচন্দ্র দেববর্মা ১৯৯৩'র ২৪শে আগষ্ট তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশিত তার 'কক-বরক ও রাজ্য-রাজনীতি শীর্ষক এক বিতর্কিত প্রবন্ধে অলীন্দ্র বাবুকে স্মরণ করে লিখেছেন, "লিপি বিতর্কের প্রশ্নে আমার বক্তব্য হলো, এই বিতর্কের কারণে সত্যিকার কক-বরক কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিশীল লেখা থেমে থাকবে কেন? একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে কক-বরক লিপির প্রশ্নে কক-বরক কবি, লেখক, সাহিত্যিকদের মধ্যে সুস্পষ্ট দুটি শিবির বিভক্ত হয়ে গেছে। এমন কি এখন এটা একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে

পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিতর্কের অবসান সুদূরে পরাহত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি শ্রীযুক্ত অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।"

কগবরকের লিপি বিতর্ক এখন মূলতঃ বাংলা লিপি ও রোমান লিপির মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুস্পস্ট দু'টি শিবিরে বিভক্ত এই লিপিদ্বয়ের প্রবক্তারা তাঁদের অবস্থান থেকে একচুল নড়তে নারাজ। কগবরকে বাংলা লিপির সমর্থনের একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রয়াত রাধামোহন ঠাকুর (দেববর্মা) এই শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা লিপিকে অনুসরণ করে তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক 'কক্-বরকমা' রচনা করেন। প্রয়াত বংশী ঠাকুর (দেববর্মা) ও জিতেন ঠাকুর (দেববর্মা) বাংলা লিপিকে অবলম্বন করে তাঁদের ককবরক বই রচনা করে গেছেন। বাংলা লিপিতে লেখা বংশী ঠাকুরের 'ককতাং কুলুই' একখানা প্রাচীন পুস্তিকা।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম পাদে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের উপজাতীয় নেতারা 'কুতাল কথমা' নামে কগবরকের একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন বাংলা লিপিকে অনুসরণ করে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কগবরকের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সুধন্বা দেববর্মা। তিনি বাংলা হরফে তাঁর সুবিখ্যাত কগবরক উপন্যাস 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে) রচনা করেছেন। ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দশরথ দেববর্মা 'কুতাল কথমা'য় নিয়মিত লিখতেন। দশরথ বাবু ত্রিপুরার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সবথেকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। তিনি কগবরকের জন্যে বাংলা লিপি চান। শুধু চান না, কগবরকে অজস্র লেখা তিনি লিখে চলেছেন এই বাংলা লিপির মাধ্যমে। 'কগবরকের জন্য বাংলা হরফ কেন চাই', তাঁর একটি সুচিন্তিত নিবন্ধ। তিনি বাংলা লিপি অবলম্বন করে ১৯৭৭ সালে 'কগ-বরক ছারাঁও' (কগবরক শিক্ষা) পুস্তক খানি প্রকাশ করেন। এবং ভূমিকায় লেখেন, "কগ-বরক ছারাঁও (কগ-বরক শিক্ষা) এই পুস্তকে কগ-বরক লিখন, পঠন প্রণালী দেওয়া হয়েছে। কগ-বরক শব্দাবলীর বাংলা এবং ইংরেজী অর্থ পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে। অ-কগ-বরক ভাষীদের পক্ষে কগ-বরকের প্রাথমিক জ্ঞান লাভে এই পুস্তিকা সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।"

ত্রিপুরার বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দেববর্মা কগবরক ভাষার একজন বিদগ্ধ লেখক। 'কুতাল কথমা' পত্রিকায় তিনিও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলা লিপিকে অবলম্বন করে ১৯৫৮ সালে তাঁর বিখ্যাত 'চেরাই সুরুংমা' রচনা করেন এবং তার ভূমিকা লিখেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব বাংলা হরফে কগবরক ভাষায়। মহেন্দ্র বাবু গত পঁচিশ বছর ধরে বাংলা হরফে তাঁর 'ইয়াপ্রি' (পদক্ষেপ) এই সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন। কগবরকের জন্যে বাংলা না রোমান এই লিপি দ্বন্দ্বে তিনিও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। ১৯৯০-এর ২২শে অক্টোবরে ত্রিপুরা দর্পণে প্রকাশিত তাঁর "কক-বরকের নব লিপি নির্ধারণ প্রসঙ্গে" নিবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন তিনি এইভাবে—

"রোমান হরফের চেয়ে বাংলা হরফে ককবরক ভাষায় পুঁথি পুস্তক রচিত হয়েছে। এই সৃষ্টিগুলি ধ্বংস করা সহজ হবে না মুষ্টিমেয় খৃষ্ট ধর্মালম্বী ককবরক ভাষীদের মুখ চেয়ে রোমান হরফ নির্দ্ধারণ যে হঠকারী সিদ্ধান্ত হবে তা স্মরণে রাখতে হবে। আমার নিজস্ব অভিমত হচ্ছে বাংলা লিপির হেরফের ঘটিয়ে কিছু চিহ্ন যোগ করে বর্তমানে ককবরক ভাষার যে নিজস্ব লিপিটি সৃষ্টি হয়েছে, তাহাই বহাল থাকুক। প্রয়োজনে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে এই লিপিকে আরো উন্নত করা হোক আর পাঠ্য পুস্তক কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করে ককবরক ভাষাকে ভারত তথা বিশ্বের ভাষামঞ্চে স্থান করে দেয়া হোক।"

ত্রিপুরার অ-উপজাতীয় বুদ্ধিজীবীরাও কগবরকের লিপি বিতর্কের বাইরে থাকতে পারেন নি, তাঁরাও কলম ধরেছেন এ নিয়ে। এই সব বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই বাংলা লিপির পক্ষে। এঁদের মধ্যে প্রয়াত মোহন চৌধুরী অন্যতম। মোহন বাবু ছিলেন ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট নেতা। কগবরকের লিখিতরূপে উত্তরণের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন কগবরকের জন্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত বাংলা লিপি তিনি 'কগবরক লিপি বিতর্ক" নামে একখানি অতিমূল্যবান পুস্তিকাও লিখে রেখে গেছেন উত্তরপুরুষদের জন্যে।

আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৯—১১ নভেম্বর, ১৯৯০ তারিখে কগবরকের লিপি বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের পূর্বে মোহন বাবু 'দৈনিক সংবাদ' এ 'কগবরক ভাষার লিখিতরূপের সন্ধানে' শীর্ষক একটি নিবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি কগবরকের লিপি নির্বাচনের প্রেক্ষাপট বাস্তব সম্মত ভাবে তুলে ধরেন। সেমিনারের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে তিনি প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানেন এইভাবে "পরিশেষে আমার আহবান রইল তাঁদের প্রতি যাঁরা রোমান হরফের পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করবেন। আমি জানি যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের ফলে এবং ইতিহাসের বিবর্তনের নিজ মাতৃভূমিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যাওয়ায় যে নব নব সংকট দেখা দিয়েছে সেখানেই প্রোথিত রয়েছে মনোবেদনা আর সেখান থেকেই উত্থিত হয়েছিল ৮ম সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী। রোমান হরফের দাবীটা গৌণ ফল হিসাবেই এসে যোগ হয়েছিল ১ দফা দাবীতে। কাজেই ঐতিহাসিক ভাবে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে এঁরাও (লিপি সেমিনারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ—লেখক) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস (৯ই অক্টোবর, ১৯৯০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত)।

লিপি বিতর্কে অংশ নিয়ে 'ত্রিপুরা দর্পণ' এর নিবন্ধকার অরুণাংশু রায়ও কলম ধরেছেন মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তিনি "ত্রিপুরা দর্পণ' এ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তারিখে 'রোমান বাংলা না দেবনাগরী লিপি হত্যাকান্ডের নেপথ্যে' নিবন্ধে লিখেছেন, "ভাষা কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাই নাকি ককবরক ভাষার লিপি

হিসাবে রোমান হরফকে সমর্থন করেন এবং বাংলাকে সমর্থন করেছেন এ রাজ্যের ভাষাবিদ কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী। আরেকজন সদস্য না রোমান, না বাংলার সমর্থন করলেন। নীরবে কি চাইছেন বলা শক্ত। হয়ত তিনি সর্বভারতীয় দেবনাগরী লিপিকেই সমর্থন করছেন। লিপির ব্যাপারে তিনি এখনো কোনো মন্তব্য পেশ করেন নি। দেবনাগরী লিপিতে যাওয়ার পক্ষে রাজ্যের ককবরক বুদ্ধিজীবীদের কোন আপত্তি থাকবে কিনা এখনো জানা যায়নি। বাংলাতে যদি এতই আপত্তি, তাহলে ইংরেজী না হয়ে দেবনাগরী হলেই ভাল, এ ধরণের মতের পক্ষে অনেকেই আছেন। যুবসমিতির (ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতি) নেতৃত্বের বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা চাইছেন বাংলা হরফকেই ককবরকের লিপি হিসেবে চালু করতে। আবার যুব সমিতির অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের অভিমত অন্য। রোমান হরফ তাঁদের একমাত্র কাম্য।" শ্রী রায় ১লা অক্টোবর, ১৯৯০ তারিখে 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকায় 'রোমান না বাংলা : লিপি নিয়ে বাক্যুদ্ধে বিতর্ক" শীর্ষক আরেকটি মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন।

কগবরকের রোমান লিপির প্রবক্তা হলো রাজ্যের 'ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতি' নামক ত্রিপুরার উপজাতিদের একটি অংশের এই রাজনৈতিক দলটি। ১৯৬৭ সালে এই দলটি যখন ৪ দফা দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন 'রোমান হরফে কগবরক চালু করতে হবে' এই দাবিটি ছিল অন্যতম। এই দল যখন ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসের সহযোগিতায় রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় তখন এই দলের ছাত্রসংগঠন টি. এস্. এফ (Tribal Students Federation) রোমান হরফে কগবরক চালু করার জন্যে দলীয় নেতৃত্বকে চাপ দিতে থাকে। অবশেষে এই চাপের মুখে পড়ে এই জোট সরকার ১লা জুন, ১৯৯০ ইং তারিখে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে (উপজাতি যুবসমিতির সভাপতি) চেয়ারম্যান করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট Script Selection Committee for Development of Kok-Borok Lauguage নামে একটি কমিটি গঠন করে। বেশ কয়েকটি বৈঠক সহ এই কমিটি কক-বরক লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক ও ভাষাবিদদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৯- ১১ নভেম্বর, ১৯৯০ ইং তারিখে সেই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ককবরক লিপি নির্ধারণের মতো বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আলোচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেই সেমিনারটিতে শেষপর্যন্ত শৃঙ্খলা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আমন্ত্রিত বক্তাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী অনাহূত রবাহূতদের উপস্থিতিতে সেমিনারটি কার্যতঃ এক হট্টগোলায় পর্যবসিত হয়। কোন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশেই হয়তো বা আলোচনা চলাকালীন কয়েকজন ছাত্র সেমিনার হলে উপস্থিত আহূত অনাহূত সকলেরই কাছ থেকে লিপি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করে। বাংলা বা রোমান লিপির সমর্থক অথবা নিরপেক্ষ, এই তিনটি পক্ষের কে কোনটার সমর্থক জানিয়ে খাতায় স্বাক্ষর করতে বলা হয়। বর্তমান নিবন্ধকার (নরেশচন্দ্র দেববর্মা—লেখক) এর প্রতিবাদ

জানান—বিষয়টি ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা অযৌক্তিক। কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে আসীন নেতৃস্থানীয় একজন প্রতিনিধি (বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত নন) স্বগর্বে ঘোষণা করেন, সেমিনারে উপস্থিত শতকরা ৯০ জনেরও ওপর রোমান লিপির সমর্থক। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেমিনার হলে উপস্থিত অধিকাংশ লোক কারা ? এদের মধ্যে কতজন সেমিনারে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ?" (উদ্ধৃত অংশটি নরেশচন্দ্র দেববর্মা লিখিত ও ২৪শে আগস্ট ১৯৯৩ ইং 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কক্‌বরক ও রাজ্য রাজনীতিঃ প্রাথমিক বক্তব্য' নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত)।

এখন কগবরকের লিপি নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে ধরছি। এ সম্পর্কে ৭ই আগষ্ট, ১৯৯০ তারিখে 'দৈনিক সংবাদে' প্রকাশিত রিপোর্ট ঃ "ককবরক ভাষার হরফ নির্বাচনের জন্য গঠিত রাজ্যভিত্তিক কমিটির প্রথম বৈঠক আজ এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাইশ সদস্যের এই কমিটিব প্রথম বৈঠকে আজ বার জন উপস্থিত ছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ ত্রিপুরার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বেশীর ভাগ সদস্যই রোমান হরফের পক্ষে অভিমত দেন বলে জানা গেছে। তবে বেশীর ভাগ সদস্যই এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে এ ব্যাপারে একঠি কনভেনশন ডাকার প্রস্তাব দেন। সে অনুযায়ী ঠিক হয়েছে যে, আগামী ১৬, ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর আগরতলায় একটি সেমিনার করা হবে। এই সেমিনার আয়োজনের জন্য নরেন্দ্র দেববর্মা ও নরেশ দেববর্মাকে চেয়ারম্যান ও আহবায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি সাব-কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, নন্দকুমার দেববর্মা, অমূল্য রিয়াং, শম্ভ কুমার জমাতিয়া, করবী দেববর্মা, কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী প্রমুখ। মহীশুরের সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেজ-এর একজন প্রতিনিধিকেও বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তবে তারা কেউ আসেন নি। আজকের বৈঠকের বেশীর ভাগ সদস্যই রোমান হরফের পক্ষে অভিমত দেন। তবে বিশিষ্ট ভাষাবিদ কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ককবরক ভাষার ক্ষেত্রে সংশোধিত বাংলা বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব দেন। ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজেজ এন্ড এপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিকস্ এবং ককবরক ভাষা পরিষদ (কগবরক উন্নয়ন পরিষদ—লেখক)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে যে গবেষণা করা হয়েছে তার ফলাফল সম্পর্কেও তিনি বৈঠকে সদস্যদের অবহিত করেন।"

সেমিনারের দু'দিন পরে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় ১৩ই নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ—"ককবরকের জন্য লিপি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আগত একমাত্র বিশেষজ্ঞ রোমান লিপি সুপারিশ করেননি। তিন দিনের এই সদ্যসমাপ্ত সেমিনারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান রোহিণী কুমার মোহন্ত।

ককবরকের জন্য রোমান লিপির সুপারিশ করেননি তিনি। সেমিনারের শেষ দিকে এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দেন।

সংবাদসূত্রে প্রকাশ, সেমিনারে অংশগ্রহণকারী একটি অংশের আচরণের ফলেই মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন তিনি।

সেমিনারে মোট একশ আঠার জন প্রতিনিধি যোগ দেন। তার মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন মাত্র সাঁইত্রিশ জন। একত্রিশ জন রোমান হরফের পক্ষে মতামত দেন, চার জন বাংলা হরফ চান এবং বাকী দু'জন নিরপেক্ষ থাকেন।

জানা গেছে, প্রথম দিন বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে কয়েকজন বক্তা উপস্থিত নির্দিষ্ট শ্রোতাদের দ্বারা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। মাঝপথে তাদের থামিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এবং বক্তারা এতে কান না দিলে তাঁদের উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য বর্ষিত হয়েছে।

প্রথম দিনের এ ঘটনার পর দ্বিতীয় দিনে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক কমে যায়। ককবরকের লিপি বিষয়ে যাঁরা মতামত জানাতে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের অনেকেই আলোচনায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

সংবাদসূত্রে প্রকাশ, সেমিনারে যুবসমিতির শীর্ষস্থানীয়রা কেউ সরাসরি কোন লিপির পক্ষে বক্তব্য রাখেননি। সভাপতি শ্যামচরণ ত্রিপুরা লিপি নির্বাচনের প্রশ্নে দেশ জাতি এবং আঞ্চলিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাপ্ত অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বিদ্যুৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী (রবীন্দ্র দেববর্মা) যা বলেন তার মর্মার্থ হল, আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, সরকার লিপি নির্বাচন কমিটির সুপারিশ পেলে তই মেনে নেবেন।

সেমিনারে ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতামত তেমন প্রাধান্য পায়নি। মূলত রাজনৈতিক এবং জাতিগত মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষার জন্য এভাবে লিপি নির্বাচন সম্ভব কিনা ইতি মধ্যেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে।"

'Script Selection Committee'-এর বৈঠকের ওপর সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকার রিপোর্টার শ্রীশেখর দত্ত ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখে প্রকাশিত 'Tribal leaders clash over Script' এই শিরোনামে যে রিপোর্ট লিখেছেন আগ্রহী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

লিপি নির্বাচন বিষয়ক উল্লিখিত সেমিনারের সুপারিশ রোমান হরফের পক্ষেই গিয়েছিলো। তারপর এই সুপারিশ পাঠানো হয়েছিলো তৎকালীন জোট সরকার (কংগ্রেস ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির যুক্ত সরকার—লেখক)-এর মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে অনুমোদনের জন্যে। কিন্তু জোট সরকার ককবরকের জন্যে রোমান হরফের সুপারিশের ফাইলটি হিমঘরেই রেখে দিয়েছিলেন—সেখান থেকে

ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। রাজ্যসরকারের এই মনোভাবে সব থেকে বিপদে পড়েন জোট সরকারের শরিক দল ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি। এই দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের ছাত্র সংগঠন টি. এস্. এফ্. (ট্রাইব্যাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন)-এর নেতাদের কাছে কোনোমতেই জবাবদিহি করতে পারছিলেন না। তাঁরা আশা করেছিলেন সেমিনারের রোমান হরফের সুপারিশ সরকার অচিরেই মেনে নিয়ে রোমান লিপিতে কগবরক চালু করার অনুমতি দেবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে কগবরকের বই-পত্র লেখা হবে। কিন্তু তাঁদের সেই আশা পূরণ হয়নি।

এরপর কগবরক লিপি বিতর্ক এক নতুন মোড় নেয়। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সুপারিশ অনুযায়ী রোমান হরফে কগবরক চালু করার জন্যে সচেষ্ট হন। উল্লেখ্য যে স্বশাসিত জেলাপরিষদের ক্ষমতায় রয়েছে উপজাতি যুব সমিতি। জেলাপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কগবরকের জন্যে রোমান লিপি পাশ করিয়ে নেয়া হয় এবং জেলাপরিষদের কর্তৃবৃন্দ রোমান হরফে কগবরকের পাঠ্য বই লেখার জন্যে প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন।

ঠিক এরই মধ্যে ত্রিপুরার রাজনীতি নতুন করে বাঁক নেয়। জোট সরকারকে হারিয়ে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বাংলা লিপির মাধ্যমে কগবরক চালু করে। কিছুদিন আগে বিধানসভার অধিবেশনে কগবরকের জন্যে বাংলা লিপিই বহাল থাকবে বলে বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁরা কগবরকের জন্যে রোমান লিপির দাবিটি নাকচ করে দেন।

এখন বেঁধেছে দ্বন্দ্ব। রাজ্যসরকার বাংলা লিপির মাধ্যমে কগবরক চালু করবেন এবং জেলাপরিষদ করবেন রোমান লিপির মাধ্যমে! একই রাজ্যে একটি ভাষার জন্যে দু'টি হরফ চালু হবে, এ কেমন কথা। কাজেই কগবরকের লিপি বিতর্ক এখন রাজ্য সরকার ও জেলাপরিষদের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। এখন দেখা যাক এই লিপি বিতর্ক কীভাবে শেষ হয়।

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটো পত্রিকা ও স্বাধীন সাহিত্য

ছোটো পত্রিকাগুলো মিলে, বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সহমর্মী পত্রিকাগুলো মিলে কোনো না-কোনো সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গত তিন দশক ধরে মাঝে মধ্যেই দেখা গেছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু কোনো আন্দোলনই বেশীদিন দানা বেঁধে থাকে নি। এসব প্রসঙ্গে বড়ো ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলো প্রধানত ও বেশীর ভাগ সময় নীরব থেকেছে। এমন কি আন্দোলনকারী ছোটো পত্রিকাগুলোও ছোটো পত্রিকার বড়ো জগতের কাছে এসব আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে পারে নি। এর কারণ আন্দোলনের ভাববস্তুর মধ্যেই নিহিত। পাশাপাশি আবার সংগঠনহীনতার কারণও রয়ে গেছে। আপন-আপন ছোটো গোষ্ঠিগুলো ছাড়া, অন্যান্য পত্রিকা বা পত্রিকাগোষ্ঠির কাছে আন্দোলনকারী ছোটো পত্রিকাগুলো আন্দোলনের ব্যাপারে ন্যূনতম সংযোগস্থাপন কিংবা কার্যকরী মতামতগ্রহণও করে ওঠে নি বা উঠতে পারে নি। অন্যদিকে আবার বলা যায়, নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাধারার দিক থেকে প্রধান যে দুই মতামত বাংলা সাহিত্যজগতে (অন্যভাষার সাহিত্যজগতের মতোই) প্রায়শঃই পারস্পরিক বিতর্কে অবতীর্ণ ছিলো, তা শেষ পর্যন্ত, একটি অঘোষিত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে। এটা শুধু গত তিন দশকের ইতিহাস নয়, বাংলা সাহিত্যজগতে এই বিতর্ক বা আন্দোলন, খুব নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রায় বিগত সাত-সাতটি দশকের মধ্যেই কম বেশী ছড়িয়ে আছে। ‘সাহিত্যের জন্য সাহিত্য’ আর ‘মানুষ বা সমাজের জন্য সাহিত্য’ প্রধানত এই দুই বিবদমান তত্ত্বের অনুসারীরাই এই বিতর্ক বা আন্দোলনের অংশীদার। এখন একটা সময় এসেছে যখন এই দুই তত্ত্বের মধ্যে একটা সমঝোতা করার চেষ্টাও চলছে, যা কখনও সম্ভব নয়। আমরা ‘স্পন্দন’ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই দ্বিতীয় তত্ত্বটির পক্ষে সাহিত্যের আন্দোলন চালিয়ে এসেছি, কিন্তু তা করতে গিয়ে সব সময়ে আবার রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুসারী ‘ফর্মুলামাফিক’ যান্ত্রিক সাহিত্যের বিরোধিতা করেছি। আমরা সবসময়েই মুক্ত মনের সাহিত্যচর্চার পক্ষপাতী, কিন্তু নৈরাজ্যবাদীতার নয়। আর এই কারণেই আমরা সমাজ সচেতনতার পক্ষপাতী। আজকাল প্রাচীনপন্থী ‘সাহিত্যের জন্য সাহিত্য’ তত্ত্বটির ধারকবাহক সাহিত্যিকের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যজগতে খুবই কম, আবার ‘সমাজসচেতন’ সাহিত্যের ‘যান্ত্রিক’ সাহিত্যিকদের সংখ্যাও, পাশাপাশি, বেশ কমে এসেছে। অতি সম্প্রতি সারা পৃথিবী জুড়েই মুক্ত চিন্তার খোলা বিতর্কের একটা প্রবণতা সমাজের

সমস্ত দিকেই ধীরে-ধীরে দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যজগতও তার থেকে পিছিয়ে নেই, এমন কি বাংলা সাহিত্যজগতেও সামগ্রিকভাবে তার কিছু-কিছু প্রকাশ ফুটে উঠছে। অনেককেই দেখা যাচ্ছে তাঁদের 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থী' মনোভাবের অনড়, অন্ধ, সংকীর্ণ চিন্তা থেকে ধীরে-ধীরে সরে আসতে, একটা নতুন কিছু খুঁজতে। আমরা এই নতুন কিছু খোঁজার পক্ষপাতী। অন্ধের মতো নয়, বরং যা আছে তার অন্তর্বস্তুকে ভালো ক'রে অনুসন্ধান করতে-করতে মানুষের পক্ষে যা ভালো হতে পারে তার অভিমুখ খুঁজতে-খুঁজতে আমরা নতুন সাহিত্যের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারি, তা সে যে নামেই হোক না কেন। 'আধুনিক সাহিত্য', 'উত্তর-আধুনিক সাহিত্য', 'সমাজসচেতন সাহিত্য', 'নতুন সাহিত্য' ইত্যাদি নানা নামেই আপাতত এই ধরণের আন্দোলন চলতে পারে। তবে তা হতে হবে মুক্ত স্বাধীনভাবে। এবং যে-কোনো নামকেই তার নামমাহাত্ম্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পশ্চিমী দুনিয়ার তত্ত্বকে বিভিন্ননামে প্রচার করার চেষ্টা, আমাদের সাহিত্য জগতে মাঝে-মাঝেই হয়েছে। এই সমস্ত তত্ত্বের অন্ধশিকারে আমাদের সাহিত্যজগত এতাবৎকাল বেশ ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। যে-কোনো দেশের ভালো সাহিত্যকে এবং সাহিত্যের তত্ত্বকে অনুধাবন করা এক ব্যাপার, আর তাকে গিলে খেয়ে বদহজম করা অন্য ব্যাপার। আমাদের দেশের সমাজের ধরণ একান্তই আমাদের। তার বৈচিত্র্য, জটিলতা ও অসমতা এমন যে তার মধ্যেই প্রধানত লুকিয়ে আছে আমাদের নতুন সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলো। অন্য সাহিত্যের কিছু কিছু উপাদান আমাদের সাহিত্যে, প্রয়োজন মতো যুক্ত হতে পারে, এইমাত্র। প্রধানত আমাদের জোর দিতে হবে আমাদের নিজেদের সমাজ, নিজেদের মানুষ, নিজেদের প্রকৃতিকে অনুধাবন করার মধ্যে। আর এর ভেতরেই আসলে লুকিয়ে আছে ছোটো কাগজের সত্যিকারের আপোসহীন সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মনে রাখতে হবে যে প্রধানত তারা ছোটো কাগজের সাহিত্যিক ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বড়ো সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

পেশাদারী সাহিত্য আর বাজারী সাহিত্য এক জিনিশ নয়। আমাদের দেশের বাজার কোনো স্বাধীন বাজার নয়। সেই বাজার রক্ষা করার সাহিত্যও তাই, প্রধানত, স্বাধীন সাহিত্য হতে পারে না। ফলে, এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের তথাকথিত 'পেশাদারী' সাহিত্যিকেরা প্রধানত 'বাজারী' সাহিত্যেরই শিকার এবং মূলত পরাধীন। কিছু ব্যতিক্রম আছে ঠিকই, তবে সেটা ব্যতিক্রমই, এখনও কোনো নিয়ম হয়ে ওঠে নি। প্রাপ্য পারিশ্রমিক স্বাধীন সাহিত্যিকদেরও পাওয়া উচিত, এবং সে চেষ্টাও আমাদের সাহিত্যজগতে যে নেই, তা নয়। তবে সর্বগ্রাসী বাজারী সাহিত্যের মধ্যে তা' পরমাণুমাত্র। যতোক্ষণ না সাহিত্যের বাজারের বর্তমান পরাধীন, বিকিয়ে-যাওয়া মূল চরিত্র পাল্টাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন সাহিত্যিকেরা খুব একটা পেশাদারীহয়েউঠতেপারবেন না, এটাই আমাদের বর্তমানসমাজ চরিত্রের নির্দিষ্ট শর্ত।

এসব কারণেই ছোটো পত্রিকা বা বড়ো পত্রিকা—এইরকম বিভাজন বাজারী সাহিত্য ও স্বাধীন সাহিত্যের সমানুপাতিক নয়। বর্তমান সমাজের বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে 'বড়ো' পত্রিকা হয়ে-ওঠা সামগ্রিকভাবে বর্তমান বাজাররক্ষা'র সম্পর্কে'র সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত। ফলে 'বড়ো' পত্রিকাগুলো 'বাজার' রক্ষা করবে বা ধরে রাখবে, এটা স্বাভাবিক। আব এটা করতে গিয়ে 'বাজারী' সাহিত্য তাদের করতেই হবে, না-হলে তাদের 'বাজার' রক্ষা হবে না। অন্যদিকে 'ছোটো' পত্রিকাগুলো সবাই বাজারে খুবই 'ছোটো'। এটা শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে, তারা সবাই বর্তমান প্রচলিত বাজার 'রক্ষা' করতে চায় না, বরং এই কারণেও যে, তাদের অনেকেই অত্যন্ত কম পুঁজি নিয়ে প্রচলিত বাজারের প্রতিযোগিতায় কিছুতেই 'বড়ো' পত্রিকা হয়ে উঠতে পারে না। এই প্রতিযোগিতায় পুঁজির অভাবকে কেউ কেউ আবার 'বিদ্রোহী-বিদ্রোহী' ভাবসাবের প্রবণতা দিয়ে কিছুটা মেটাতে চায়, এবং এভাবে তারা কেউ কেউ 'ছোটো' পত্রিকা থেকে 'মাঝারী' পত্রিকায় (বাজারের অর্থে) বদলে যায়, আর তখন তাদের 'বিদ্রোহী-বিদ্রোহী' ভাবসাবের প্রবণতাও কিছু কিছু বদলাতে থাকে। কিন্তু যারা সত্যি-সত্যিই মুক্তমনের উদ্দেশ্যে আপোসহীন, স্বাধীন সাহিত্যপত্র প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে যেতে চায়, তারা সাধারণত 'ছোটো' পত্রিকা হিশেবেই সাহিত্যজগতে বা সাহিত্যের 'বাজারে' নিজেদের অবস্থান রাখে বা রাখতে বাধ্য হয়। সাহিত্যজগতে, এমন কি বাজারেও, তারা যে 'মাঝারি' বা 'বড়ো' পত্রিকা হয়ে উঠতে পারে না, তার আরেকটি কারণ তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পুঁজির সঙ্গেই যুক্ত নয়।

বাংলা ছোটো পত্রিকার জগত সম্পর্কে আরো কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা, এখানে করা দরকার। বিশেষ করে, এই সাহিত্যজগতে 'লিটল্ ম্যাগাজিন' কথাটি পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরে চলে এসেছে ব'লেও এই আলোচনাটি জরুরী। কেননা 'লিট্ল ম্যাগাজিন' কথাটির সাথে আপোসহীন, স্বাধীন, মুক্তসাহিত্যের চর্চা ব্যাপারটিকে অনেকেই নিঃশর্ত সম্পর্কযুক্ত হিশেবে দেখে থাকেন। 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দবন্ধ এখন বাংলা সাহিত্যপত্রের জগতে বেশ পরিচিত ও প্রচারিত, সন্দেহ নেই। পশ্চিমী লেখকদের একটি গোষ্ঠির এককালের এক ধরণের 'বিদ্রোহজাতীয়' সাহিত্য আন্দোলনের সাথে জড়িয়েথাকা এই শব্দজোড়া যারা প্রথম বাংলা ছোটোপত্রিকার জগতে আমদানী করেন, তারা কিন্তু কেউ, বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের বেলাতে, কোনো অর্থেই, বিদ্রোহী নন। কিন্তু 'বিদ্রোহী-বিদ্রোহী' একটা ঢক্কানিনাদের মাধ্যমে ও পাশাপাশি 'প্রাতিষ্ঠানিক' বা অন্য অর্থে 'ব্যবসায়িক' বড়ো কাগজগুলোর সাথে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংযোগের সহযোগে তারা ব্যবসায়িক কাগজ-গুলোর আপোসকামী সাহিত্যিক প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি ছোটো কাগজে তারা অনেকসময়ে একটা 'লড়াকু-লড়াকু' প্রতিচ্ছবি বা সাহিত্যিক ভাবমূর্তি ধরে রাখার চেষ্টা ক'রে গেছেন, এবং এখনও যাচ্ছেন। এই চিত্র শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাংলা

সাহিত্য জগতেই নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যেও বর্তমান। বরং তুলনায় উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত ত্রিপুরা ও আসামের বাংলা সাহিত্যজগতে এই ব্যাপারটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। যাই হোক, এভাবেই 'আধুনিক' ভাবমূর্তি'মাখা কিছু 'প্রতিষ্ঠিত' (কেউ-কেউ ইতিমধ্যে প্রয়াত) সাহিত্যিকেরা একটা তথাকথিত তরুণ তুর্কি'দল তৈরী ক'রে নিয়েছেন, এবং এটাতে তারা খানিকটা সফলও হয়েছেন, কেননা 'বড়ো' কিছু ব্যবসায়িক কাগজে তাদের স্থানটি শুধু পাকাই ছিলো না বা নেই, সেইসাথে 'বড়ো' কাগজে 'জায়গা' দেয়ার সুযোগ দিয়ে এই তথাকথিত তরুণ তুর্কি'দের বেশ কয়েকজনকে তারা নিজেদের 'শিষ্য' ক'রে নিতে পেরে থাকেন। এসব নিশ্চয়ই অনেকের অজানা নয়। আবার, কেউ-কেউ এই ধরণের ব্যাখ্যার সাথে একেবারেই একমত নন।

অন্যদিকে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' বা 'লিট্‌ল ম্যাগ' আন্দোলনের নাম ক'রে কোনো-কোনো সময় অভিমুখহীন, উদ্দেশ্যবিহীন তথাকথিত 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা' ও আমরা, বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে, মাঝে-মধ্যে দেখে থাকি। এদের কেউ-কেউ নৈরাজ্যবাদী ধরণের মননের প্রতীক, অথচ এদেরই মধ্যে কেউ-কেউ কোনো ধরণেরই আপোসকামী মনোভাবের শিকার নন। 'আপোসকামী' শব্দটি 'সাহিত্যের নামে ব্যবসায়িক পত্রিকার সাথে নিজের সাহিত্যের চরিত্রের আপোস করা'—এই অর্থে বলতে চাইছি। অথচ এই নৈরাজ্যবাদী মননের আপোসহীন সাহিত্যিকেরা সমাজের মধ্যে কোনো ভালোকিছু প্রায় খুঁজেই পান না, এটা'ই এদের মনোজগতের সমস্যা। 'হাংরি জেনারেশান' আন্দোলনের কেউ-কেউ এর মধ্যে পড়েন, তা সেটা এই আন্দোলনের নামে-বেনামে যেভাবেই হোক না কেন। কিন্তু এই ধরণের আন্দোলনের অংশীদার বা উৎসাহদাতা কেউ-কেউ, ঝোপ বুঝে নিজেদের সাহিত্যের 'আপোসহীন' ভাবকে বাঁকিয়ে বা বিকিয়ে দিয়ে 'বড়ো' ব্যবসায়িক পত্রিকায় ঢুকে পড়েন। শুধু এরাই নন, কোনো-কোনো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন লেখকরাও হৃদয় পরিবর্তন ক'রে, বা 'কৌশলে'র আশ্রয় নিয়ে এই ধরণের কান্ড ক'রে থাকেন। ওইসব ব্যবসায়িক পত্রিকায় তো আর 'হাংরি' বা 'শাস্ত্রবিরোধী' ইত্যাদি ধরণের সাহিত্য চলে না, কেননা তাতে ব্যবসা হয় না। মাঝেমধ্যে এ'রকম দু-একটা লেখা ঐসব ব্যবসায়িক বড়ো পত্রিকা ছাপাতে পারে, কিন্তু প্রধানত বা ক্রমাগত কখনই নয়। ফলে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' শব্দবন্ধের মধ্যে যদি কোনো বিদ্রোহীমনন লুকিয়েও থাকে, 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'-করা বহু পত্রিকা বা লেখকদের মধ্যেই আসলে তা' নেই। এটা সামগ্রিকভাবে ছোটো সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রের একটা লক্ষণীয় দিক।

তাই, 'বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন' বলতে নির্দিষ্ট কিছুই বোঝায় না। ছোটো সাহিত্যপত্র বা সাময়িকপত্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, পাঠকের তথাকথিত 'মনোরঞ্জন' ইত্যাদির দিকে বা ব্যবসার দিকে তাকিয়ে নিজেদের সাহিত্যচর্চার অন্তর্বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে সমঝোতা না-করার চেষ্টা, ইত্যাদি নানারকম পরিশ্রমী

প্রচেষ্টাগুলো অবশ্য ছোটো পত্রিকার অনেক সম্পাদক ও লেখকের মধ্যেই উজ্জ্বলভাবে আছে, কিন্তু তারা অনেকেই তথাকথিত 'লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের শরিক' ব'লে নিজেদের মনে করেন না। তারা বরং সুস্থ আপোসহীন সাহিত্য আন্দোলনের অংশীদার ব'লে নিজেদের ভাবেন। কেননা তারা অনেকেই তাদের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানেন যে, কয়েকজন তরুণ মিলে একটা 'লিটল ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকা বের ক'রে ফেললেই তারা আপোসহীন সাহিত্য আন্দোলনের অংশীদার হয়ে গেলেন, এমন কোনো কথা নেই। সৃষ্টিশীল নতুন সাহিত্যচর্চার ইতিহাস ও সর্বোপরি সময়ই প্রমাণ ক'রে দেয়, কারা আপোসকামী, বাজারী, সৃষ্টিশীলতাবিরোধী সাহিত্যের পথিক, আর কারা তা নয়।

আমি কিন্তু এও বলতে চাইছি না, 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নাম দিয়ে যারা সাহিত্যের কাগজ করেন, তারা সকলেই আসলে 'বাজারী' সাহিত্যে ঢুকে পড়ার সোপান হিশেবে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'কে ব্যবহার করেন, কিংবা তারা সকলেই নৈরাজ্যবাদী মননের সাহিত্যে বিশ্বাসী। সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় যে 'লিটল ম্যাগাজিন' লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে, তাদের কোনো সদুদ্দেশ্য নেই, এমনটিও আমাদের বক্তব্য নয়। গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সবসময়েই আছে। এমই বক্তব্য যে, 'লিটল ম্যাগাজিন' নাম দিয়েই হোক বা না হোক, বহু বাংলা ছোটো সাহিত্য পত্রের মধ্যেই নিহিত আছে ভালো কাগজ গড়ে তোলার চেষ্টা, সুস্থ সাহিত্যচর্চার চেষ্টা, কোনোরকম 'বাজারী' সাহিত্যের তোয়াক্কা না-করেই। তবে বেশীর ভাগ ছোটো সাহিত্যপত্রই তাদের আপোসহীন সাহিত্যচর্চার অভিমুখ সম্পর্কে, এবং অবশ্যই তার নন্দনতাত্ত্বিক দিকগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার নন।

স্পন্দনের নিজস্ব কথা

নানা ধরণের ছোটো পত্রিকার খবরাখবর রাখা তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও সম্ভাব্য সমাধানের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা ও সমাধানের চেষ্টা করা— এইসব প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য। দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে আমরা আমাদের পদ্ধতিতে এসব করার চেষ্টা ক'রে আসছি, যখন থেকে (বঙ্গাব্দ ১৩৭৩ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৬ থেকে) আমরা 'স্পন্দন' সাহিত্যপত্র বের ক'রে আসছি। এ সব-কিছুরই অন্যতম প্রচেষ্টা হিশেবে ভারতবর্ষের বাংলা-পাঠকদের বৃহত্তম দ্বিতীয় রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা (ও উপজাতি সাহিত্যের ব্যাপারেও) সাহিত্যচর্চার মূল্যায়নে আমরা জোর দিয়ে আসছি 'স্পন্দন'-এর মাধ্যমে ; যে-কারণে গত দশ বছর ধরে 'স্পন্দন' কলকাতা ও আগরতলা থেকে যৌথ উদ্যোগে বেরোয়। এটা করতে গিয়ে আমাদের পত্রিকাপ্রকাশ আপাতত কয়েকবছর যাবৎ একটু অনিয়মিত হয়ে পড়লেও, এই ধাক্কাটা আমরা অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

যে-কোনোভাবে সাহিত্যচর্চা করে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হোলো, 'নতুন সাহিত্য' তৈরী করা বা সৃষ্টি করা, যা বাজারী সাহিত্যের থেকে যোজন মাইল দূরে। 'বাজারী সাহিত্য' শুধু বড়ো ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলোই করে না,

এমন কি 'লিটল ম্যাগাজিন' বা 'সাহিত্যপত্র' নামধারী অনেক ছোটো পত্রিকাও ক'রে থাকে। কোনটা বাজারী সাহিত্য আর কোনটা তা নয়, তার মাপকাঠিও এক-একজনের কাছে বা এক-এক পত্রিকাগোষ্ঠির কাছে এক-একরকম। এইসব আলোচনার সময় মাঝে-মাঝেই আসে এবং এখন বিশেষভাবেই এসেছে। গত তিনদশকের ও বর্তমানের পত্রিকাগুলোর কিছু-কিছু লেখা অভিনিবেশ দিয়ে লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায়।

ষাটের দশকের শেষদিক থেকে 'স্পন্দন' ও কিছু কিছু পত্রিকায় বহু সহমর্মী পত্র পত্রিকার প্রচার করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু পত্র পত্রিকা মিলে সাহিত্য পত্রের কাজ হিশেবেই 'স্পন্দন' নানা সামাজিক আন্দোলনে যোগদান করে থাকে। এইরকম কিছু পত্রিকা মিলে পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত সাহিত্য পত্র মঞ্চও সত্তরদশকে তৈরী করা হয়েছিলো। যেখান থেকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, পুলিশী অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে মাঝে মাঝে 'সাহিত্য বুলেটিন' বেরুতো। এসব নিয়ে সভা সমিতি, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনকরা হোতো, যার ফলশ্রুতিতে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ১৯৭৬ সালে 'বন্দী মুক্তি সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি কমিটি' তৈরী হয়েছিলো, যাঁরা একটা ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন। আবার এও ঠিক যে, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি অংশে (১৯৭৬-এর শেষদিক পর্যন্ত) সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেই ছোটো পত্রিকা বা 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নামধারী পত্রিকা তুলনা-মূলক কম সংখ্যায় ও কমবার প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি আমাদের সংযুক্ত সাহিত্য মঞ্চেরও কোনো-কোনো পত্রিকা 'জরুরী অবস্থার' চাপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তখন বহু তথাকথিত 'বিদ্রোহী' লিট্‌ল ম্যাগাজিনের 'বিদ্রোহ' হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলো। রাজনৈতিক-সামাজিক ঐ রকম প্রতিকূলতা আবারও আসতে পারে, এটা সবারই মনে রাখা দরকার।

ছোটো পত্রিকাও যে গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকেই সরকারী বিজ্ঞাপন পাবার ও 'নিউজপ্রিন্ট' পাবার অধিকারী, এই আন্দোলনেরও আমরা অংশীদার। কেননা, এটা একটি নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। কিন্তু 'স্পন্দন' কখনও সরকারী বিজ্ঞাপন বা বেসরকারী বড়ো কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ছাপায়নি বা ছাপানোর চেষ্টা করেনি। বিজ্ঞাপন সাধারণত 'স্পন্দন' বিনে পয়সায় ছাপায়, ভালো পত্রিকা ও ভালো বইয়ের তথ্য দিয়ে। 'স্পন্দন' যে কোনো 'ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন' ছাপায়না, এটা নিশ্চই একটা বিরল প্রতিবাদ। অত্যন্ত অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় থেকেও 'স্পন্দন' এটা করে যাচ্ছে বহু বছর ধরে। যে দীর্ঘ বছর ধরে একটা সাহিত্য আন্দোলনের জন্য কাজ 'স্পন্দন' করে চলেছে সেটা কারুর কারুর কাছে নাকি একটা 'ফর্মুলামাফিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' মনে হয়েছে। সমাজসচেতন সাহিত্য এক ব্যাপার, আর সাহিত্যের নামে রাজনীতি অন্য ব্যাপার। প্রথমটি 'স্পন্দন' করে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু দ্বিতীয়টির বিরোধিতা করে আসছে সবসময়।

বাংলা ছোটো সাহিত্যপত্রের জগতে এই ধরণের নানারকম দৃঢ় মূল্যবোধের কাজ-গুলোকে সবারই লক্ষ্য করা দরকার। নাহলেই ছোটো পত্রিকাগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টাও উদ্দেশ্যবিহীনতায় ভুগবে।